ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

The Ahmadi Fortnightly

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ১৫তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ০৩ ফাল্গুন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ২২ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩ হিজরি | ১৫ তবলীগ, ১৩৯১ হি. শা. | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ ঈসাব্দ

এই সংখ্যাতে আছে

- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- প্রদত্ত ৩ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২-র **জুমুআর খুতবা**
- **প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সত্যতায় হাজারো নিদর্শন**
  মোজাফ্ফর আহমদ রাজ
- আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসা হাজারো ধর্মপ্রাণ সদস্যদের উপস্থিতি এবং যুগ-খলীফার তাজা নির্দেশনার মধ্য দিয়ে ব্যপক সফলতার সাথে সমাপ্ত
- **সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার উপরই বিশ্বের টিকে থাকা নির্ভর করছে**
  হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)
- বাংলার কিংবদন্তি
  জার্মানীর প্রথম মিশনারী
  খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী
- **মা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি এক সূত্রে গাঁথা**
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- প্রেস রিলিজ
  New Ahmadiyya Mosque opened by World Leader in London
- প্রেস রিলিজ
  WORLD MUSLIM LEADER SAYS THAT PERSECUTION CAN NEVER HALT AHMADIYYAT'S PROGRESS

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

Member | REHAB

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক
প্রপার্টিজ লিঃ

Kounik Properties Ltd
Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**
207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.
Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mPxc Î

ঈসা নবীউল্লাহ্‌র পুনঃনাযিলের তত্ত্বকথা

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কেন সর্বত্র মসীহ্‌র আগমনের জন্য **'নুযূল'** শব্দ ব্যবহার করলেন আর 'আবির্ভূত করা' বা 'প্রেরণ করা' ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে **'নুযূল'** বা অবতরণ শব্দ কেন অবলম্বন করেছেন প্রশ্নটি তোমার মনে হয়তো সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। জেনে রেখো! এতে গভীর রহস্য নিহিত আছে। কুরআন যার প্রতি বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিত করেছে তা হলো, খোদার নবীরা (আ.) এ জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র দিকে উত্থিত হন। যে পৃথিবী তারা ছেড়ে যান এর জন্য তাদের মাঝে কোন ধরণের ব্যতিব্যস্ততা ও চিন্তা থাকে না বরং তাঁরা প্রভুর কাছে সানন্দে গিয়ে মিলিত হন। মহা সুখ-শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দঘন পরিবেশে তাঁরা মহাশক্তিধর খোদার কাছে চলে যান আর খোদাপ্রাপ্তদের সাথে মিলিত হন। কখনও কখনও এমনও হয়, যখন তাঁদের কারো উম্মত পৃথিবীতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আর তারা তাদের প্রাথমিক অজ্ঞতার দিকে বরং এর চেয়েও নোংরা ও নিকৃষ্ট অবস্থার দিকে ফিরে যায় তখন খোদার কাছে সেই উম্মতের নবী সে সংবাদ শুনে কেঁপে ওঠেন আর দারুণভাবে দুঃখ-বেদনা ও ব্যাকুলতার সম্মুখীন হন আর তাঁর উম্মতের সংশোধনের জন্য পৃথিবীতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু খোদার অমোঘ সিদ্ধান্ত **'আন্নাহুম লা ইয়ারজিউন'** (সূরা আম্বিয়া:৯৬) অনুসারে পুনরায় আসার কোন উপায় থাকে না। তখন খোদা পৃথিবীতে তাঁর অনুরূপ একজন মসীল বা সদৃশ সৃষ্টি করেন। তাঁর অর্থাৎ প্রথমজনের যাবতীয় সংকল্প এঁর মাঝে রেখে দেন আর তাদেরকে এক ও অভিন্ন অস্তিত্বে পরিণত করেন যেন তাঁরা একই নির্যাস থেকে সৃষ্ট। এবং তিনি তাঁর আধ্যাত্মিকতাকে এঁর মাঝে সৃষ্টি করেন। তিনি আসবেন স্বর্গীয় অস্ত্রসহকারে ফিরিশ্‌তার ডানায় ভর করে। তাঁর সাথে জাগতিক কোন উপকরণ থাকবে না। তিনি স্বর্গীয় নিদর্শন ও এর বরকতের দ্বারা সমর্থিত হবেন যেন তিনি এক ফিরিশ্‌তা যিনি পার্থিব শয়তান* ও তার অগ্নিশিখাকে নির্বাপন এবং তার দুস্কৃতির অপনোদন কল্পে আকাশ থেকে নাযিল হয়েছেন। স্মরণ রেখো, মুসলমানদের উপর যখন বিভিন্ন প্রকার সমস্যার বাঁধ ভেঙ্গে পড়বে, তাদের পার্থিব ও জাগতিক উপকরণ হ্রাস পাবে আর খ্রিষ্টানদের প্রাধান্য, তাদের সম্পদ ও প্রাবল্য দেখে এদের হৃদয় কেঁপে উঠবে এবং তাদের ধর্মীয় নেতা যারা সবচেয়ে বড় যুগ-দাজ্জাল এবং শয়তানের মূর্ত প্রতিচ্ছবি, যাদের মত শয়তান কেউ কখনও দেখেনি আর যাদের ষড়যন্ত্রের ন্যায় ষড়যন্ত্র কেউ কখনও লক্ষ্য করেনি, এহেন সময় **'নুযূল'** শব্দ এটি একটি স্বর্গীয় শুভসংবাদ যেন পরিস্থিতি দৃষ্টে তারা নিরাশ না হয়।

তাই শেষ যুগের দুর্বল মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তা'লা শুভসংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন, যখন তোমরা খ্রিষ্টধর্মের নেতাদের ধরাপৃষ্ঠে ছেয়ে যেতে দেখবে, বিভিন্ন ষড়যন্ত্র, ছল-চাতুরী, জ্ঞান, মানুষের হৃদয় নিজেদের প্রতি আকর্ষণ, কৃত্রিম নমনীয়তা ও কোমল ভাষণ, কপট শিষ্টাচার, নানাবিধ ধূর্ততার প্রয়োগ আর শিক্ষা, সম্পদ, নারী, পদবী, চিকিৎসা, লোভ-লিপ্সা ও বড় বড় আশা-আকাঙ্খা জাগিয়ে মনস্তুষ্টির বিধান এবং ছল-চাতুরী, জাগতিক ক্ষমতা ও রাজত্বের লোভ, সরকারের নৈকট্য ও শাসকদের দৃষ্টিতে সম্মানের প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে তারা পৃথিবীবাসীদের ধ্বংস করছে। এর পাশাপাশি যখন তোমরা লক্ষ্য করবে, তারা নিজেদের কথার যাদু, আর তাদের বিস্ময়কর সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ এবং জাগতিক কলাকৌশলের চরম উন্নতি ঘটিয়ে তারা সমস্ত পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে- তখন তোমরা ভয় পেয়ো না, দুঃখিতও হয়ো না। আমরা ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের দুর্বলতা ও শৈথিল্য লক্ষ্য করছি, এ যুগে আমরা তোমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহস, সম্পদ ও উপায়-উপকরণের অপ্রতুলতাও প্রত্যক্ষ করছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা দুর্বল এক জাতিসত্তায় রূপান্তরিত হয়েছো। অতএব আমরা এ যুগে আমাদের নিজ সন্নিধান থেকে তথা উর্ধ্বলোক থেকে আমাদের এক মহান মনোনীত বান্দাকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করছি এবং তোমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে ও ফুৎকারে গড়া এক সাহায্য আসছে, যার সাথে জাগতিক কোন উপায়-উপকরণের মিশ্রণ নেই আর এভাবে আমরা ধর্মের সত্যতা অনাচারীদের সামনে তুলে ধরবো।

(**'হামামাতুল বুশরা'** পুস্তকের বাংলা সংস্করণ থেকে)

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১২
সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার উপরই বিশ্বের টিকে থাকা নির্ভর করছে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)	১৮
প্রেস রিলিজ **New Ahmadiyya Mosque opened by World Leader in London**	২৪
প্রেস রিলিজ **WORLD MUSLIM LEADER SAYS THAT PERSECUTION CAN NEVER HALT AHMADIYYAT'S PROGRESS**	২৬
প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সত্যতায় হাজারো নিদর্শন মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজ	২৮
মা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি এক সূত্রে গাঁথা মাহমুদ আহমদ সুমন	৩০
বাংলার কিংবদন্তি **জার্মানীর প্রথম মিশনারী** খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী	৩২
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসা হাজারো ধর্মপ্রাণ সদস্যদের উপস্থিতি এবং যুগ-খলীফার তাজা নির্দেশনার মধ্য দিয়ে ব্যপক সফলতার সাথে সমাপ্ত	৩৪
সংবাদ	৩৮
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৫১

হাদীস শরীফ

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্বজগতকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্ত্বা যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তাআলা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী প্রেরণ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয় বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্ত্বা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে তাঁর কল্যাণের দ্বারা উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে অর্থাৎ যাঁর কল্যাণ দু'জগতেই সমভাবে মানবের কল্যাণ ঘটাবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তাআলা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার পাবেন তিনি হলেন, আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তাআলা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান্নাবীঈন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

‘আমাদের নেতা ও প্রভু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদা তাআলার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মোজেজা প্রকাশিত হয়েছিল তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না, এবং নিজেকে উম্মতি বলে প্রচারও করতেন না। যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন। কিন্তু, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক বিশেষ এই গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি-খাতামুন্নাবীঈন। এর এক অর্থ হচ্ছে, নবুওয়াতের সমস্ত পূর্ণতা উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর ওপরে খতম হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,- তাঁর (সা.) পরে আর নতুন শরীয়তওয়ালা কোন রাসূল নেই; এবং তার (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর উম্মত বহির্ভূত।

বরং, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি খোদা তাআলার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সা.) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিল বা সরাসরি নবী নন। তাঁকে (সা.) এতো উচ্চ মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ অন্তত:পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দন্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ! যারা দিগ্বজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সা.) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমান কালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য চাকরের মতই মনে করেন, এবং তাঁর (সা.) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী নিদর্শন, এই হাজারো ঐশী আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি তাঁর ওপরে খোদা তাআলার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই।

তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বুঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওয়াত কি জিনিষ। এছাড়া, মোজেজা সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী সাহায্য।

আমরা কি বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই কারণে আমাদের ওপরে প্রকাশিত হয়েছে।’ (চশমা মারেফাত, পৃ ৮-১০)

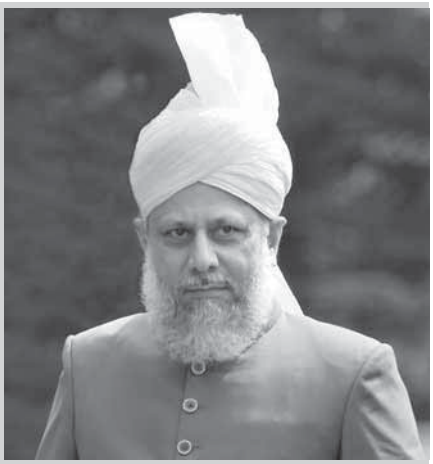

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১২-এর (১০ তবলীগ, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সূরা ফাতিহা এমন একটি সূরা যা আমরা প্রত্যেক নামাযেই পাঠ করে থাকি। হাদীসে এই সূরার বেশ কয়েকটি নাম এবং কল্যাণরাজির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে এই সূরাকে সূরাতুল্ সালাত নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি 'সালাত' অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে আমার এবং বান্দার মাঝে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছি। অর্থাৎ সূরার প্রথমাংশে খোদা তা'লার গুণাবলীর উল্লেখ আছে আর অপরাংশে রয়েছে বান্দার পক্ষে দোয়া'।

অতএব সূরার এই তাৎপর্যকে প্রত্যেক নামাযীর সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর প্রতি অভিনিবেশের পাশাপাশি এথেকে বেশি বেশি লাভবান হবারও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যেতে হবে, অনুরূপভাবে এতে যেসব দোয়া অন্তর্নিহিত আছে তার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। এসব দোয়া থেকে কল্যাণ লাভ করার জন্য প্রত্যেক নামাযের প্রতিটি রাকাতে খুবই মনোযোগের সাথে তা পাঠ করা উচিত। এছাড়া এটিও সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, এই সূরার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেরও একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পুরনো (ঐশী) গ্রন্থাবলীতে উক্ত সূত্রে এর উল্লেখ রয়েছে আর স্বয়ং সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তুও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সময়কার নিয়ামতরাজি, তা অর্জন এবং সেই যুগের অনিষ্ট এবং পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। অতএব এ দৃষ্টিকোন থেকে বর্তমান যুগের মুসলমানদের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমান উলামারা জাতিকে এমনভাবে নিজেদের করতলগত করে ফেলেছে, তাদের চিন্তা-ভাবনার শক্তিকেও এমনভাবে বিকল করে দিয়েছে, তারা এ বিষয় নিয়ে ভাবতেও প্রস্তুত নয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন। এ কারণেই মূলতঃ সাধারণ মুসলমানরা এ বিষয়ে চিন্তা করতে চায় না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় এমনও একটি শ্রেণী আছে যারা চিন্তা-ভাবনা করে আর মসীহ্ ও মাহদীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

অতএব এসব মানুষ যারা মৌলভীদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে, এসব মৌলভী এবং নামধারী আলেমরা এদেরকে অনিষ্ট আর পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই প্রত্যেক দরদী হৃদয় এ কথা বলতে বাধ্য, নোংরামী, শিরক এবং পথভ্রষ্টতার যুগ চলছে আর সর্বত্রই এর বিস্তার পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর একে দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কোন বিশেষ বান্দার প্রয়োজন আছে। তাদের মাঝে শুধু এ চেতনা থাকলেই হবে না বরং এজন্য অনুসন্ধানও আবশ্যক– কোথাও এই ব্যক্তি এসে যাননি তো? আল্লাহ্ তা'লার সেই বিশেষ বান্দা অবশ্যই এসে গেছেন। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, অধিকাংশ মানুষ আলেমদের অন্ধ অনুকরণের ফলে তাঁকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নয় বা ভয়-ভীতির কারণে তাঁকে মানতে প্রস্তুত নয়।

কাজেই নিজেদের হঠকারিতা পরিহার করে আলেমদের এবং সাধারণ জনগণকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আগত নির্দেশনা গ্রহণ করা উচিত। যাহোক আমাদের কাজ হলো, বাণী পৌঁছানো আর আমরা তা পৌঁছাতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকবো। তবে এর পাশপাশি আহমদীদের, যারা মহানবী (সা.)-এর এই নিষ্ঠাবান প্রেমিকের অনুসারী হবার দাবী করি তাদেরকেও নিজেদের জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। সূরা ফাতিহার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু হতে বেশি বেশি লাভবান হবার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাসমগ্রের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে এই সূরার উল্লেখ করেছেন এবং এর বিষয়বস্তু সবিস্তারে তুলে ধরেছেন তা আমাদের উপর অবশ্যই একটি দায়িত্ব অর্পণ করে, অর্থাৎ আমরা যেন এটি বুঝতে সচেষ্ট হই আর এর বুৎপত্তি অর্জনের চেষ্টা করি। যাতে এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুকে নিজ সত্তায় ধারণ করে আমরা কল্যাণমন্ডিত হতে পারি।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াত অর্থা بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -এর পরের আয়াত الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবো। তিনি এই আয়াতে অন্তর্হিত বিষয়াবলীকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন। এ আয়াত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক ভান্ডারে (বইতে) সংরক্ষিত বিভিন্ন অংশ থেকে আজ আমি কয়েকটি উদ্ধৃতি চয়ন করেছি। এ দিকগুলো তিনি চিহ্নিত করেছেন,

এ ছাড়া কেবল এই এক আয়াত সম্পর্কেই তাঁর অগণিত উদ্ধৃতি রয়েছে। নিঃসন্দেহে এগুলো পড়লে, শুনলে জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি প্রখর হয়। কিন্তু একবার পড়লেই কোন মানুষ এর গভীর মর্ম অনুধাবন করতে পারে না আর এর গভীওে পৌঁছাও সম্ভব নয়। একে বুঝার জন্য ব্যক্তিগত পড়াশোনাও আবশ্যক; তাহলে আমরা যুগ ইমামের সেই আধ্যাত্মিক ভান্ডারের সঠিক জ্ঞান ও বুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হবো আর এর মাধ্যমে লাভবান হতে পারবো।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে করেছেন, তিনি বলেন, الْحَمْدُ لِلّٰهِ অর্থাৎ সকল প্রসংশা সেই উপাস্য সত্তার প্রাপ্য যার মাঝে সকল উৎকর্ষ গুণাবলীর সমাহার ঘটেছে'। অর্থাৎ সকল প্রসংশা ও গুণকীর্তন আল্লাহ্ তা'লার জন্যই প্রযোজ্য। যিনি সকল গুণাবলীর আধার, যাঁর মাঝে সকল গুণাবলী একীভূত আর আল্লাহ্ তা'লার সত্তাতেই সকল বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে পাওয়া যায়।

তিনি (আ.) বলেন, 'যাঁর নাম আল্লাহ্! তাঁর সত্তায় সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান। আমরা পূর্বেও বর্ণনা করে এসেছি, পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্ সেই পরিপূর্ণ সত্তার নাম যিনি সত্যিকার উপাস্য এবং যার সত্তায় সকল গুণাবলীর সমাহার ঘটেছে এবং যিনি সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত'। অর্থাৎ সকল গুণাবলীর সমাহার এবং সকল প্রকার দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নীচ কথাবার্তা ও নীচ বিষয়ের তিনি ঊর্ধ্বে, সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর থেকেই উৎসারিত। 'আর তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং সকল কল্যাণের উৎস।

কেননা, খোদা তালা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফে নিজের নাম 'আল্লাহ্'কে অন্য সকল নাম ও গুণের ধারক ও বাহক আখ্যা দিয়েছেন'। অর্থাৎ 'আল্লাহ্' নামের মাঝে অন্যসব গুণাগুণ বিদ্যমান রয়েছে, শুধুমাত্র এক আল্লাহ্ নামের মাঝেই আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছে। কোন স্থানে অন্য কোন নামকে এমন উন্নত স্থানে আসীন করেন নি।

অতএব 'আল্লাহ্' নাম পূর্ণ আধার হবার কারণে অর্থাৎ এসব গুণাবলীর সর্বোত্তম ধারক-বাহক হবার কারণে তা সেসব বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গীন চিত্র যা তাঁর মাঝে বিদ্যমান। আর যেহেতু এটি (আল্লাহ্) সকল গুণবাচক নামের সমষ্টি আর বৈশিষ্ট্যের উৎস তাই এর অর্থ দাঁড়ায়, তা সকল উৎকর্ষ বৈশিষ্ট্যে অলংকৃত'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার 'আল্লাহ্' নামে সকল গুণাবলী সমষ্টিগতভাবে একীভূত।

তিনি (আ.) বলেন, 'অতএব الْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর সারমর্ম হলো, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য এবং ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা হোক বা বিশ্বে বিরাজমান বিস্ময়কর বিষয়াদির নিরিখেই হোক সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র আর এতে অন্য কোন অংশিদার নেই। আর যত ধরনের প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক চিন্তা করতে পারে অথবা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মাথায় আসতে পারে, ঐসব গুণ আল্লাহ্‌র সত্তায় নিহিত রয়েছে।

আর এমন কোন ভালো গুণ নেই, যে গুণের সম্ভাব্যতা (বা প্রয়োজন) সম্পর্কে বিবেকতো সাক্ষ্য দেয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হতভাগ্য মানুষের মতো ঐ গুণ থেকে বঞ্চিত'! মানুষ মনে করে আর তার বিবেক সাক্ষ্য দেয়, এটি একটি ভালো গুণ অথচ আল্লাহ্ তা'লা একজন দুর্বল মানুষের মত ঐ গুণ থেকে বঞ্চিত থাকবেন–এটি কখনো হতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, 'বরং কোন বুদ্ধিমানের মেধা এমন কোন সৎগুণ উদ্ভাবনই করতে পারে না যা আল্লাহ্‌র মাঝে পাওয়া যায় না'। মানুষের চিন্তাশক্তি সীমিত, ঐ পর্যন্ত পৌঁছতেই পারে না আর সেসব বৈশিষ্ট্যকে আয়ত্তও করতে পারে না।

তিনি (আ.) বলেন, 'মানুষ সর্বোচ্চ যত বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবতে পারে তার সবই তাঁর মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। আর স্বীয় সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসার ক্ষেত্রে তিনি সার্বিক অর্থে সম্পূর্ণ এবং সকল প্রকার মন্দ বা অপবিত্রতা হতে তিনি সম্পূণরূপে পবিত্র'।

এজন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিখানো একটি দোয়া হলো, 'হে আল্লাহ্! তোমার যেসব গুণবাচক নাম আমার জানা আছে তার কল্যাণও কামনা করছি আর তোমার যেসব গুণাবলী আমার জানা নেই তার কল্যাণও প্রার্থনা করছি'। মোটকথা মানুষ কখনো আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য ও নামসমূহকে আয়ত্ত্ব করতেই পারে না।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার পর الْحَمْدُ -এর অর্থ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'স্মরণ থাকে যে, 'হামদ' সে প্রশংসাকে বলা হয় যা কোন প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তির ভালো কাজের পর করা হয় অধিকন্তু (হামদ) এমন পুরস্কার দাতার প্রশংসার নাম, যিনি স্বেচ্ছায় জেনেশুনে পুরষ্কার দিচ্ছেন এবং পছন্দ মোতাবেক অনুগ্রহ করেছেন'। অর্থাৎ প্রশংসা তারই করা হয় যিনি পুরস্কার দান করেন। তার প্রশংসা করা হয় যিনি নিজ সংকল্প অনুসারে পুরষ্কার দেন।

আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছা বা মর্জিমতো দেন। মর্জি কেবল আল্লাহ্‌রই থাকতে পারে। তিনি তাঁর মর্জিমতো অনুকম্পা করেন। 'এবং প্রকৃত অর্থে 'হামদ' বা প্রশংসা কেবল সেই সত্তারই প্রাপ্য যিনি সকল প্রকার কল্যাণ এবং নূরের (জ্যোতি) উৎস'। অর্থাৎ সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর থেকেই উৎসারিত হয়। 'তিনি নিজ প্রজ্ঞা অনুসারে কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন, অজ্ঞাতসারেও নয় আর কোন বাধ্যবাধকতায়ও নয়'। অর্থাৎ সব কিছু জেনে বুঝে, জ্ঞাতসারে অনুগ্রহ করেন। অজ্ঞাতসারে বা বাধ্য হয়ে নয়। 'প্রকৃত পক্ষে 'হামদ' এর এই অর্থ কেবলমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা সত্তা আল্লাহ্‌র মাঝেই পাওয়া যায়।

তিনিই একমাত্র মহানুভব। আদি ও অন্তে সকল অনুগ্রহ তাঁর পক্ষ থেকেই আর ইহ ও পরকালেও সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। এবং প্রত্যেক সেই প্রশংসা যা তিনি ব্যতীত অন্য কারো করা হয় তাও মূলতঃ তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো যে প্রশংসা করা হয় তাও আল্লাহ্‌র কারণেই করা হয়। অন্যের প্রশংসাও মূলতঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই করা হয়, সেসব বিশেষত্বের কল্যাণে করা হয়, ভালো কোন কাজের কারণে করা হয় যা আল্লাহ্ তা'লার গুণেরই প্রতিফলন হিসেবে সে করেছে। অথবা আল্লাহ্‌র রহিমিয়্যত বা রহমানিয়্যত তার ব্যক্তিত্বে প্রভাব ফেলে তাকে কারো উপকারে আসার মতো যোগ্য করেছে। এরপর সে কারো উপকারে আসার যোগ্যতা লাভ করেছে, যে কারণে সে প্রশংসিত হয়েছে। মোটকথা এই পৃথিবীতে কোন মানুষ যে কাজ করে তা সে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তির সাহায্যেই করতে পারে। কাজেই চূড়ান্ত পর্যায়ে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

এ সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো লিখেছেন, 'হামদ সেই প্রশংসাকে বলা হয় যা কোন ক্ষমতাশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভালো কাজের জন্য তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্যে মৌখীকভাবে প্রকাশ করা হয় আর সর্বোৎকৃষ্ট প্রশংসা মহাপ্রতাপান্বিত প্রভুর জন্য নির্ধারিত। অল্প হোক বা বেশি, সর্ব প্রকার 'হামদ' বা প্রশংসা আমাদের সেই প্রভুরই প্রাপ্য যিনি পথভ্রষ্টদের

পথপ্রদর্শক এবং লাঞ্ছিত ও নিগৃহীতদের মর্যাদা প্রদানকারী। প্রশংসিতদের তিনি প্রশংসিত'। অর্থাৎ প্রশংসাযোগ্য সকল সত্তাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

অতএব যেভাবে আমি বলেছি, সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, '(তিনি হলেন) পথভ্রষ্টদের পথপ্রদর্শক। পথভ্রষ্টদের পথ প্রদর্শনের কারণে পথপ্রাপ্তগণ খোদা তা'লার প্রতি বিনত হবে, তাঁর প্রশংসা করবে। জগদ্বাসীর দৃষ্টিতে তারা লাঞ্ছিত হলেও আল্লাহ্ তা'লার কাছে তারা সম্মান লাভ করে। যেমন নবীদের বেলায় ঘটে থাকে! মানুষ বলে, ভাসাদৃষ্টিতেও তোমার অনুসারীদেরকে আমাদের কাছে হেয় ও তুচ্ছ মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এক সময় এ অবস্থা বদলে দেন। একই ফেরাউন প্রাণ ভিক্ষা চায়। একই মক্কার নেতারা তাদের প্রাণের নিরাপত্তা চায়। এটি এক সত্যিকার প্রশংসার প্রতি বিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এটি দেখে অন্তর্দৃষ্টি অধিক প্রখর হয়'।

অনুরূপভাবে এ যুগেও যারা মনে করে, আহমদীয়া জামাতের কোন মর্যাদা ও গুরুত্বই নেই, এরা তুচ্ছ মানুষ, আমরা তাদেরকে হেন করবো তেন করবো। প্রধাণতঃ আল্লাহ্ তা'লা সঙ্গে সঙ্গেই (তাদেরকে) স্বীয় শক্তিমত্তা প্রকাশ করছেন, কিন্তু এমনও এক সময় আসবে যখন এসব লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সারকথা হলো, আল্লাহ্ তা'লার 'হামদ'-এর অর্থ হলো খোদা তা'লা পরম প্রশংসিত এবং এবং তিনি পরিপূর্ণ প্রশংসাকারী। আর খোদা তা'লার প্রশংসাই সকল সম্মান ও মর্যাদার উৎস। একজন বিশ্বাসীর দায়িত্ব হচ্ছে, এ প্রশংসার উপলব্ধি অর্জন করে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় বা নিরাপত্তার বেষ্টনিতে স্থান লাভ করা। 'হামদ' শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে এবং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনকে 'হামদ' শব্দ দ্বারা কেন আরম্ভ করেছেন? এর মধ্যে কি প্রজ্ঞা নিহিত?

সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ 'হামদ' দ্বারা আরম্ভ করেছেন, কৃতজ্ঞতা ও স্তুতির মাধ্যমে নয়। কেননা 'হামদ' শব্দটি এ উভয় অর্থই বহন করে, তা এ উভয়ের পরিপূরক ঠিকই কিন্তু একই সাথে এতে সংশোধন, অলংকার ও সৌন্দর্যের অর্থ অন্যান্য শব্দের তুলনায় গভীর'। অর্থাৎ এতে সৌন্দর্য, আকর্ষণ এবং সংশোধন সবক'টি দিকই রয়েছে।

'কাফিররা অযথাই তাদের মূর্তিগুলোর গুণকীর্তন করতো এবং তাদের প্রশংসার জন্য 'হামদ' শব্দ ব্যবহার করতো এবং এই বিশ্বাস পোষণ করতো যে, এসব উপাস্য সকল দান ও পুরস্কাররাজীর উৎস এবং দানশীলদের অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে তাদের মৃতদের জন্য শোক প্রকাশকারীদের পক্ষ থেকে মিথ্যা গৌরব গাঁথা বর্ণনা করতে গিয়ে মাঠে-ঘাটে বা ভোজ সভায় সেভাবে 'হামদ' বা প্রশংসা করা হতো যেভাবে এই রিযিকদাতা, তত্ত্বাবধায়ক এবং নিশ্চয়তা প্রদানকারী আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করা উচিত। এজন্য এই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র) এসব লোকদের এবং অপরাপর সব মুশরিকদের খন্ডন আর বুদ্ধিমত্তার সাথে যারা কার্য সাধন করে তাদের জন্য এতে উপদেশ রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা এ শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রতিমাপূজারী, ইহুদী, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য মুশরিকদের দোষারোপ করেন। যেন তিনি বলছেন, হে পৌত্তলিকগণ! তোমরা কেন তোমাদের উপাস্যদের প্রশংসা করো এবং কেন বাড়িয়ে বাড়িয়ে তোমাদের প্রবীণদের প্রশংসা করো? তারা কি তোমাদের সেই প্রভু যারা তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের প্রতিপালন করেছে। নাকি তারা এমন দয়াময় যারা তোমাদের প্রতি করুণা দেখায়, তোমাদের বিপদাপদ দূর করে এবং তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে? নাকি তোমরা যে কল্যাণ লাভ করেছো তার রক্ষণাবেক্ষণ করে বা সমস্যার কুফল থেকে তোমাদের মুক্ত রাখে এবং রোগ-ব্যাধি হতে তোমাদের আরোগ্য দান করে? তারা কি পুরস্কার ও শাস্তি দিবসের অধিপতি? কখনোই না। বরং একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই পরম আনন্দ দান, হিদায়াতের উপকরণ সরবরাহ, দোয়া সমূহ গ্রহণ এবং শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে তোমাদের প্রতি করুণা করেন, তোমাদের প্রতিপালন করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যবানদের অবশ্যই প্রতিদান দিবেন'।

এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, 'আমাদের খোদা পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ খোদা, সকল প্রকার উৎকর্ষ গুণাবলী ও সমস্ত প্রশংসার আধার এবং তাঁরই মাঝে তা একীভূত'। তিনি (আ.) বলেন, 'এর সাথে সাথে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -তে এ ইঙ্গিতও রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভের ব্যাপারে নিজ মন্দকর্মের ফলে ধ্বংস হয়েছে অথবা তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করেছে! আল্লাহ্ তা'লার পরাকাষ্ঠা হতে চোখ ফিরিয়ে নেয়ায়, তাঁর অলৌকিক বিষয়াদি না দেখে চোখ বন্ধ করে রাখায় এবং যে সব বিষয় তাঁর সঠিক মর্যাদার পরিচায়ক সেগুলোকে মুশরিকদের মতো অবহেলা করায় সে ধ্বংস হয়েছে'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে না চেনার কারণে সে ধ্বংস হয়েছে। অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লার আসনে বসায়, তার চোখে আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা যথাযথ ভাবে ধরা পড়ে না বা গোপন থাকে অথবা অন্য কাউকে সে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড় করালে সে ধ্বংস হবে। তিনি (আ.) বলেছেন, 'তুমি কি খ্রিস্টানদের দেখো না? তাদেরকে একত্ববাদের আমন্ত্রণ দেয়া হয়েছিল কিন্তু বিভ্রান্তকারী আত্মা ও স্খলনকারী কামনা-বাসনা তাদের সামনে ভ্রষ্টতাপূর্ণ ধারণাকে মনোরম করে দেখিয়েছে ফলে তারা অধম বান্দাকে খোদা বানিয়ে বসেছে আর এই ব্যাধিই তাদেরকে ধ্বংস করেছে। তারা ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার সুরা পান করে। তারা আল্লাহ্ তা'লার পরাকাষ্ঠা ও তাঁর নিজস্ব গুণাবলী ভুলে গেছে এবং তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা প্রস্তাব করেছে। তারা যদি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ও তাঁর মর্যাদাসম্মত পরাকাষ্ঠা নিয়ে গভীরভাবে প্রণিধান করতো তবে তারা ভুল করতো না আর তারা ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হতো না।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা এখানে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লাকে চেনার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি হতে রক্ষাকারী আইন হলো, তাঁর উৎকর্ষতা সম্পর্কে গভীরভাবে প্রণিধান এবং তাঁর সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণাবলীর অন্বেষণ করা'। অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীর সঠিক ধারণা লাভ করা এবং তা অবলম্বনের চেষ্টা করা। 'আর এসব গুণাগুণ জপ করা হয়, যা সমস্ত জাগতিক নিয়ামতরাজি হতে উত্তম এবং সব ধরনের সাহায্যের তুলনায় বেশি উপযুক্ত।

আর তিনি তাঁর ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে যে সব গুণের প্রমাণ দিয়েছেন অর্থাৎ তাঁর শক্তি, সামর্থ, প্রতাপ ও উদারতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। কাজেই এ কথাটি স্মরণ রেখো এবং উদাসীন হয়ো না, আর জেনে রেখো রবুবিয়্যত, রহমানিয়্যত এবং বিচার দিবসে একচ্ছত্র আধিপত্য শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার। অতএব হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তোমাদের প্রভু-

প্রতিপালকের আনুগত্য করতে অস্বীকার করো না এবং একত্ববাদী মুসলমান হয়ে যাও।

পুনরায় এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন, প্রথম তথাকথিত বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হবার পর অন্য কোন নুতন গুণ পরিগ্রহণ করা, তার অবস্থার পরিবর্তন হওয়া, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হওয়া এবং দুর্বলতার পর গুণে অলংকৃত হওয়া'র মত কোন ধারণার তিনি ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ তাঁর মাঝে কোন প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে না তাই নুতন সৌন্দর্যের প্রশ্নই উঠে না। তাঁর মাঝে কেবল সৌন্দর্যই বিরাজমান। এমন নয় যে, পূর্বের গুণের সাথে নুতন গুণ যোগ হয়ে মানোন্নয়ন ঘটেছে। 'বরং শুরু ও সমাপ্তীতে আর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে চিরস্থায়ী প্রশংসা তাঁরই। যে ব্যক্তি এর পরিপন্থী কথা বলে সে সত্যচ্যুত হয়ে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়'।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা সব ধরনের দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। যে ব্যক্তি তাঁর গুণাবলী সঠিক ভাবে অনুধাবন করে না সে ধ্বংসের গহ্বরে তলিয়ে যায়। অতীতের বিভিন্ন জাতির ধ্বংসের কারণ হলো তারা খোদা তা'লার গুণাবলীকে বুঝেনি, শিরকে বা বহুশ্বরবাদে লিপ্ত হয়েছে আর যদি জেনেও থাকে তাহলে তা ভুলে গিয়েছে।

এরপর মুসলমানদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যে, তাদের উপাস্য সমস্ত প্রশংসার অধিকারী এ বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -শব্দে মুসলামানদের এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যখন তাদের প্রশ্ন করা হয় বা জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাদের উপাস্য কে? তখন প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব, এ উত্তর প্রদান করা যে আমার উপাস্য হচ্ছেন তিনি যিনি সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি তাঁর জন্য প্রমাণিত তাই তুমি, যারা ভুলে যায় তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে না'।

অতএব কেবল মৌখিক ভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলাই যথেষ্ট নয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা মাত্রই এ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত যে, আমার একজন উপাস্য আছেন, খোদা আছেন– যাঁর আমি ইবাদত করি। ইবাদত এ জন্য করি, কারণ তিনি আমার প্রভু-প্রতিপালক, আল্লাহ্।

অতঃপর অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন, 'আর এ বাক্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দ্বারা এই সূরা আরম্ভ করা হয়েছে যার অর্থ হলো, সকল প্রশংসা ও গুণকীর্তন সেই সত্তার জন্য স্বীকৃত যার নাম হলো 'আল্লাহ্'। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্যের মাধ্যমে আরম্ভ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্মার গভীর আবেগ এবং সহজাত আকর্ষণের মাধ্যমে যেন খোদা তা'লার ইবাদত করা হয়। প্রেম ও ভালবাসা সমৃদ্ধ আকর্ষণ কারো জন্য আদৌ সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এটি প্রমাণিত না হয় যে, সে সত্তা এমন পূর্ণ গুণাবলীর আধার যা দেখে হৃদয় অবলিলায় প্রশংসা গাইতে আরম্ভ করে। আর এটি প্রমাণিত, পূর্ণাঙ্গীন প্রশংসা দু'ধরনের গুণের প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। একটি পূর্ণ সৌন্দর্য আর অপরটি পূর্ণাঙ্গীন অনুগহ (অর্থাৎ কারো মাঝে সৌন্দর্য থাকলে তার প্রশংসা করা হয় বা কারো প্রতি কারো দয়া বা অনুগ্রহ থাকলে তার প্রশংসা করা হয়ে থাকে) আর কারো মাঝে উভয় প্রকার গুণাবলীর সমাহার ঘটলে তার জন্য হৃদয় নিবেদিত ও উদ্বেলিত হয়।

উভয় প্রকার গুণাবলী সত্যান্বেষীদের সামনে প্রকাশ করাই পবিত্র কুরআনের বড় উদ্দেশ্য যাতে এ অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় সত্তার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় আর আত্মার আকর্ষণ এবং আবেগের মাধ্যমে তাঁর দাসত্ব করে। সেই খোদা যার দিকে কুরআন ডাকছে, তিনি নিজের মাঝে কেমন গুণাবলী ধারণ করেন– প্রথম সূরাতেই তিনি এর সূক্ষ্ম চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই এ কারণেই এই সূরাকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্যের মাধ্যমে আরম্ভ করেছেন যার অর্থ হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার প্রাপ্য যাঁর নাম 'আল্লাহ্'।'

অতএব আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই সেই সত্তা যাঁর মাঝে সকল প্রকার সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের সমাহার ঘটেছে, এ জন্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সৌন্দর্য এবং দয়া কী তা একস্থানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে সেটি একটি ভিন্ন বিষয়, এখানে কেবল সংক্ষিপ্তাকারে বলে দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লার সৌন্দর্যের অর্থ হচ্ছে, সব ধরনের গুণাবলী তাঁর মাঝে বিদ্যমান। তিনি যে সমস্ত পূর্ণাঙ্গীন গুণাবলীর আধার, তাঁর মাঝে যে সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর দয়া বা অনুগ্রহ সর্ম্পকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) চারটি মৌলিক নীতি এ সূরার আলোকে উল্লেখ করেছেন; যা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। 'তাঁর প্রথম অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি 'রব' অর্থাৎ সৃষ্টি করে সেটিকে উদ্দিষ্ট গন্তব্যের উৎকর্ষতায় পৌঁছিয়ে থাকেন। সেটির লালন-পালন করেন। দ্বিতীয় অনুগ্রহ হচ্ছে, তাঁর 'রহমানিয়্যত' বৈশিষ্ট্য; সে অনুযায়ী তিনি প্রত্যেক জীবকে শক্তি দান করেছেন আর প্রয়োজন অনুপাতে তাকে উপকরণ সরবরাহ করেছেন। আর এর মধ্য হতে সবচেয়ে বড় অংশ দিয়েছেন মানুষকে। আর তাঁর তৃতীয় অনুগ্রহ হচ্ছে, তাঁর রহিমিয়্যত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তিনি দোয়া এবং পুণ্যকর্মকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা প্রদান করেন এবং এর প্রতিদান দেন আর বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। চতুর্থ এহসান বা অনুগ্রহ হলো, তাঁর বিচার দিবসের মালিক হওয়া। যার সুবাদে তিনি স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহে যেভাবে চান আর যতটা চান ভূষিত করেন। কর্মের ফলাফল প্রকাশ করে থাকেন আর তা সম্পূর্ণরূপে খোদা তা'লার অনুগ্রহে হয়ে থাকে'।

এ হলো তাঁর চারটি এহসান বা অনুগ্রহ, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন আর আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম।

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ভ্রস্টতার যুগের পর হিদায়াতের যুগ নিয়ে আসেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'লা স্বীয় উক্তি رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুই তাঁর পক্ষ থেকে।

পৃথিবীতে যতো হিদায়াত প্রাপ্ত, ভ্রষ্ট এবং ভ্রান্তিতে নিপতিত দল আছে সবাই আলামিন (জগত সমূহ) এর অন্তর্ভূক্ত। কখনো ভ্রষ্টতা, অবিশ্বাস, অবাধ্যতা আর ভারসাম্যহীনতা (আলম) ছেয়ে যায় আর পৃথিবী অন্যায় ও অবিচারে ভরে যায়। মানুষ মহা প্রতাপান্বিত খোদার পথ পরিত্যাগ করে। তাঁর ইবাদত করা বা বান্দা হবার প্রকৃত মর্মও বুঝে না আর রবুবিয়্যত বা প্রতিপালনের সুবাদে খোদার প্রাপ্যও প্রদান করে না। ইবাদত বন্দেগীও প্রকৃত অর্থে করে না আর রব বা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহ্র অধিকার তাঁকে প্রদান করে না। যুগ এক তমাসাচ্ছন্ন রাতের মতো হয়ে যায় আর ধর্ম সেই সমস্যায় নিদারুনভাবে জর্জরিত হয়।

তখন আল্লাহ্ তা'লা আর একটি আলম বা বিশ্বের উন্মেষ ঘটান। তখন এই পৃথিবী একটা নতুন পৃথিবীতে রূপ নেয়। আর আকাশ থেকে একটা নতুন তকদীর বা নিয়তি অবতীর্ণ হয়। মানুষকে শনাক্তকারী ও তত্ত্বজ্ঞানী হৃদয় এবং খোদা তা'লার

নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ভাষা দেয়া হয় আর তারা নিজেদেরকে খোদা তা'লার সামনে একটি মসৃন পদদলিত রাস্তার মত উপস্থাপন করে। আশা ও ভীতি সহকারে তাঁর প্রতি তারা ধাবিত হয়। তারা লজ্জাশীলতার বসে অবনত দৃষ্টির সাথে তাঁর পানে তাকায়। আর এমন চেহারা নিয়ে আসে যা অবাভমোচনকারীর সত্তার পথপানে চেয়ে থাকে। ইবাদতে তাদের অবিচলতা গগনচুম্বি হয়ে থাকে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে উল্লেখ করেছেন, আরেকটি আলম বা বিশ্বের উন্মেষ ঘটান যার ফলে এই পৃথিবী একটা নতুন পৃথিবীতে পরিণত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও ইলহাম হয়েছিল, আর তিনি বলেন, 'কাশ্‌ফে দেখেছি, আমি একটা নতুন জমিন ও নতুন আসমান সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি বললাম আসো এখন মানব সৃষ্টি করি।'

এ যুগের মৌলভীরা একথা শুনে হট্টগোল বাঁধিয়ে বসে, দেখো! খোদা হবার দাবী করে বসেছে। তিনি বলেন, 'এটি খোদা হবার দাবী নয় বরং এর অর্থ হলো, খোদা তা'লা আমার হাতে এমন এক পরিবর্তন সাধন করবেন যার ফলে আকাশ এবং জমিন যেন নতুন রূপ লাভ করবে। আর খাঁটি মানুষের জন্ম হবে, এমন মানুষ যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করবে, বান্দা হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালন করবে আর লালন-পালনকারী হিসেবে আল্লাহ্ তা'লাকে চিনতে পারবে'।

তিনি (আ.) বলেন 'এমন দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি তাকায় যা লজ্জাশীলতার কারণে অবনত থাকে। আর এমন চেহারা নিয়ে আসে যা অবাভমোচনকারীর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। ইবাদতে তাদের অবিচলতা গগনচুম্বি হয়ে থাকে। মানুষ ইবাদত বন্দেগীতে রত হয় আর এই সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করে। ভ্রষ্টতা যখন চরম আকার ধারণ করে এমন সময় এমন মানুষের একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। অধঃপতনের জের হিসেবে মানুষ হিংস্র প্রাণী ও গবাদি পশু সদৃশ হয়ে যায়। তখন ঐশী কৃপা এবং খোদার স্থায়ী অনুগ্রহ অন্ধকারকে দূরীভূত করা এবং ইবলিসের দাঁড় করানো অট্টালিকা ও তাঁবুগুলো ভূপাতিত করার উদ্দেশ্যে (স্বর্গে) এক ব্যক্তিকে দাঁড় করানোর প্রয়োজন দেখে। করুণাশীল খোদার পক্ষ তখন শয়তানের বাহিনীর মোকাবিলার জন্য একজন ইমাম আসেন'।

যেমনটি কিনা আমি এখনই বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছে, তিনি কাশ্‌ফে দেখেছেন, 'শয়তান ও রহমান উভয়েরই সৈন্য রয়েছে যাদের মাঝে অহরহ যুদ্ধ লেগেই থাকে। (অর্থাৎ একটি বাহিনী শয়তানের আর অপরটি হলো রহমানের যারা সর্বদা বিবাদমান থাকে।) এদেরকে কেবল তারাই দেখে যাদেরকে দৃষ্টিশক্তি দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তারাই দেখতে পায়, যারা সত্যিকার অর্থে ইবাদত-বন্দেগী করে কেবল তারাই দেখতে পায়। আর যারা খোদার লালন-পালন বা 'রব' বৈশিষ্ট্যকে বুঝে তারাই দেখতে পায়)। এক পর্যায়ে মিথ্যার গলায় বেড়ি পরানো হয় আর মিথ্যা মরিচিকার মত যুক্তি উবে যায়।

অতএব সেই ইমাম শত্রুর বিরুদ্ধে সব সময় জয়যুক্ত থাকেন আর হিদায়াতপ্রাপ্ত শ্রেণীর সাহায্যকারী হয়ে থাকেন। হিদায়াতের পতাকা সমুন্নত রাখেন আর পরহেজগারীর (তাক্বওয়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যেখানে বা যে সময় আলোচনা হয়) সময় ও সমাবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলেন'। অর্থাৎ বেশির ভাগ সময় পরহেজগারী বা তাক্বওয়া, সৎকর্ম এবং খোদাভীতির মধ্যে কাটে, এমন বৈঠক বা সভা হয় যেখানে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তিনি (আ.) বলেন, 'এক পর্যায়ে মানুষ বুঝে যে, তিনি কুফর বা অবিশ্বাসের হোতাদের কারারুদ্ধ করেছেন তাদের বাঁধন শক্ত করে দিয়েছেন আর মিথ্যা ও প্রতারণার প্রতীক হিংস্রদের গ্রেফতার করেছেন। আর তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি কুপ্রথার অট্টালিকাকে ভূপাতিত এবং গম্বুজকে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি ঈমানের বাণীকে সুসংহত আর এর উপকরণকে সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি স্বর্গীয় রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছেন আর সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করেছেন'।

অতএব আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে নতুন জমিন ও নতুন আসমান সৃষ্টি হয়েছে যদ্বারা আমরা কল্যাণমন্ডিত হচ্ছি। আমাদেরকে সকল প্রকার বিদাত থেকে নিজেদের দূরে রাখতে হবে আর ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে, যথাযথ ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতের চেষ্টা করতে হবে এবং তাঁর রবুবিয়্যত বা প্রতিপালন সম্পর্কে সঠিক চেতনায় সমৃদ্ধ হতে হবে, তবেই কেবল আমরা এই নতুন জমিন ও নতুন আসমান হতে কল্যাণমন্ডিত হতে পারবো।

বান্দা যখন তার প্রভুকে প্রকৃত অর্থে চিনে আর ইবাদতের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত হয় তখন সে رَبِّ الْعَالَمِينَ বা বিশ্ব প্রতিপালক খোদার সেই বুৎপত্তি অর্জন করে যা তাকে অন্যদের মাঝে স্বতন্ত্র করে তোলে; এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'পবিত্র সত্তা আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় উক্তি رَبِّ الْعَالَمِينَ এই ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা।

আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে তাঁরই প্রশংসা কীর্তন হয়, প্রশংসাকারীরা তাঁর প্রশংসায় রত এবং তাঁর স্মরণে ব্যপৃত থাকে। প্রতিটি বস্তু তাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসার গান গেয়ে থাকে, তাঁর কোন বান্দা যখন কামনা-বাসনাকে পরিহার করে নিজের আবেগ অনুভূতিকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর পথে আর তাঁর ইবাদতে বিলীন হয়ে যায়, নিজের সেই প্রভুকে চিনে যিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাকে লালন-পালন করেছেন তখন সে পুরো সময় তাঁর প্রশংসায় নিমগ্ন থাকে, সর্বান্তকরণে বরং নিজ অস্তিত্বের প্রতিটি অণু দিয়ে তাঁকে ভালবাসে; তখন সে ব্যক্তি সমগ্র বিশ্ব জগতের মাঝে একটি (ক্ষুদ্র) বিশ্ব হয়ে যায়'।

এরপর তিনি এ সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, 'বিভিন্ন আলামীন (বিশ্ব) এর মাঝে একটি বিশ্ব হলো সেটি যাতে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন'।

এরপর তিনি (আ.) তাঁর নিজ যুগের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা সন্ধানীদের প্রতি করুণা করতে গিয়ে আরো একটি জামাত বা দল গঠন করেছেন। যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামাত বা দল। আমরা যেহেতু বিশ্ব প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি তাই এই আলম বা এই জগতভূক্ত হবার জন্য আমাদের নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছাধীন হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত যেন আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের পুরস্কারে ভূষিত হতে পারি।

আলামীন-এ কি কি অন্তর্ভূক্ত আছে আর আলামীনের সংজ্ঞা কী? এ বিষয়টি ব্যাখ্যা

করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'আলামীন বলতে সৃষ্টির স্রষ্টা খোদা ছাড়া বাকী সব কিছুকে বুঝায়; তা আত্মার জগতই হোক বা বস্তু জগত; বা তা এই পৃথিবীর চন্দ্র-সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র সদৃশ কিছু হোক না কেন। (অর্থাৎ আত্মা হোক বা বস্তু যাই হোক না কেন আল্লাহ্ ছাড়া বাকী সবকিছুই আলামীন ভূক্ত) অতএব সমগ্র আলম বা বিশ্ব জগত–স্রষ্টার প্রতিপালন বা রবুবিয়্যতের গন্ডিভূক্ত'।

কাজেই যেখানে সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার রবুবিয়্যত বা লালন-পালনের গন্ডিভূক্ত আর আমাদের জানাও আছে, আল্লাহ্ তা'লাই সকল আলম বা জগত সমূহের প্রতিপালন কর্তা তা সত্বেও এমন সময়ও আসে যখন মানুষ মানুষকে নিজের প্রতিপালক এবং রিয্‌কদাতা বা জীবিকার বিধানকারী মনে করে। সমাজের চাপের কারণে জাগতিকতা ছেয়ে যায়, এমন ক্ষেত্রে একজন মু'মিনের উচিৎ তাৎক্ষণিক ভাবে আত্মজিজ্ঞাসা করা আর তওবা ও ইস্তেগফারের সাথে বিশ্ব প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করা; যেন নতুন যে জমিনে আমরা বসতি গেড়েছি আর যেই আকাশের ছাদ আমাদের মাথার উপরে আছে তদ্বারা আমরা কল্যাণ মন্ডিত হতে পারি।

বাহ্যিক চাহিদার পাশাপাশি আত্মিক চাহিদাও আল্লাহ্ তা'লা পূরণ করেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'খোদা সমগ্র জগতের খোদা! আর যেভাবে তিনি বাহ্যিক ও দৈহিক চাহিদা এবং দৈহিক লালন পালনের নিরিখে কোন তারতম্য না করে সকল প্রকার সৃষ্টির জন্য বস্তু ও উপকরণ সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন তাই আমাদের নীতি অনুসারে তিনি رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বা বিশ্ব প্রতিপালক। তিনি খাদ্য-শষ্য, আলো-বাতাস ইত্যাদি সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

একইভাবে তিনি সকল যুগে সকল জাতির সংশোধনের জন্য বিভিন্ন সময় সংস্কারক প্রেরণ করেছেন যেমনটি কিনা তিনি নিজেই বলেন, وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

(সূরা আল্ ফাতের: ২৫)।

অতএব চিরাচরিত রীতি অনুসারে যেহেতু তিনি প্রেরণ করে আসছেন সেহেতু এ যুগেও প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজি কোন বিশেষ জাতির একক বিশেষত্ব নয়, رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -এর এই আঙ্গিক সর্ম্পকে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনের সুচনা করেছেন প্রথম আয়াত الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -এর মাধ্যমে, যা সূরা ফাতিহায় রয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত উৎকর্ষ ও পূত-পবিত্র গুণাবলী খোদারই বিশেষত্ব, যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালক। বিভিন্ন জাতি, যুগ ও দেশ 'আলম' শব্দের অন্তর্গত। যে আয়াতের মাধ্যমে কুরআন শরীফের সুচনা হয়েছে তা সত্যিকার অর্থে সেই সকল জাতির (ধারণার) খন্ডন যারা আল্লাহ্ তা'লার সার্বজনিন প্রতিপালন বা খোদার রবুবিয়্যতরূপী কল্যাণধারাকে কেবল স্বজাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে আর অপরাপর জাতিগুলোকে আল্লাহ্‌র বান্দাই মনে করে না যেন আল্লাহ্ তা'লা পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় তাদের ছুড়ে ফেলেছেন বা ভুলে গেছেন যেন তারা তাঁর সৃষ্টিই নয়'।

অতএব যেভাবে মানুষের প্রতিপালনের জন্য বিশ্বপ্রতিপালক জাগতিক উপকরণ সরবরাহ করেন সেভাবে আধ্যাত্মিক উপকরণও সৃষ্টি করেন, কেননা এটিই তাঁর রবুবিয়্যত বা লালন-পালন। যে একে অস্বীকার করে সে তাঁর রবুবিয়্যত বা প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে। কাজেই যারা সূরা ফাতিহা পাঠ করা সত্ত্বেও এ যুগে মসীহ্ মওউদকে অস্বীকার করছে! তাদের ভাবা উচিত। আর আমাদেরকেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর চেষ্টা করা উচিত, আমরা যেন আমাদের আধ্যাত্মিকতা ও তাক্বওয়ায় উন্নতি করতে পারি।

তিনি (আ.) আরো বলেন, 'হামদ' শব্দে আরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে তাহলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমার গুণাবলীর নিরিখে আমাকে সনাক্ত করো আর আমার পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে আমাকে চিন। আমি দুর্বলদের মতো নই বরং আমার প্রশংসনীয় মর্যাদা অতিশয়োক্তির সাথে প্রশংসাকারীদের প্রশংসার চেয়েও বড়। আর তোমরা আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য দেখবে না যা আমার সত্তায় নেই। যত প্রাণান্তকর চেষ্টাই করো না কেন আর নিজেদের কাজে গভীরভাবে নিমগ্নদের ন্যায় এসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে যতই মাথা ঘামাও না কেনো তোমরা আমার প্রশংসনীয় গুণাবলীর গুণ কখনোই আয়ত্ত করতে পারবে না। ভালভাবে প্রণিধান করো এমন কোন স্তুতি তোমাদের চোখে পড়ে কী যা আমার সত্তায় নেই? তোমরা এমন কোন পরাকাষ্ঠার খবর রাখো কী যা আমার মাঝে এবং আমার দরবারে দেখা যায় না? যদি তোমরা এমনটি মনে করো তাহলে তোমরা আমাকে চিনতে পারো নি বরং তোমরা অন্ধদের অন্তর্ভূক্ত।

প্রকৃত কথা হলো আমি আল্লাহ্! আমার প্রশংসনীয় বৈশিষ্টাবলী ও স্বীয় পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে ধরা দেই। মুষলধারে বৃষ্টির কথা আমার কল্যাণের মেঘমালা থেকে জানা যায়। অতএব যারা আমাকে সকল উৎকর্ষ গুণাবলী এবং পরাকাষ্ঠার সমাহার হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আর তারা যেখানে যে পরাকাষ্ঠাই দেখেছে আর চিন্তার শেষ সীমা বা দিগন্তে যে মহিমাই তাদের চোখে পড়েছে তারা তাকে আমার সাথেই সম্পৃক্ত করেছে আর তাদের মেধা ও মননে যে মাহাত্ম্যই ধরা দিয়েছে আর প্রত্যেক শক্তি যা চিন্তার জগতে তাদের চোখে পড়েছে (অর্থাৎ তাদের চিন্তাভাবনার জগতে যা তাদের চোখে পড়ে) তারা তাকে আমার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। কাজেই এরা এমন মানুষ যারা আমাকে চিনার পথে পরিচালিত হচ্ছে। সত্য তাদের সাথে তাই তারা সফলকাম হবে।

অতএব খোদা তোমাদেরকে নিরাপত্তার বেষ্টনিতে আশ্রয় দিন। উঠো! মহাপ্রতাপান্বিত খোদার বৈশিষ্ট্যাবলী অন্বেষণে ব্যপৃত হও আর বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবীদদের ন্যায় এ সম্পর্কে ভাবো ও প্রণিধান করো (অর্থাৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও গভীর চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগাও) ভালভাবে খতিয়ে দেখো আর পরাকাষ্ঠার সকল আঙ্গিকের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দাও আর এই পৃথিবীর বাহ্যিক ও আত্মিক আঙ্গিনায় সেভাবে এর সন্ধান করো যেভাবে একজন চরম লোভী মানুষ গভীর একাগ্রতার সাথে স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করার কাজে নিয়োজিত থাকে।

অতএব যখন তোমরা তার পরাকাষ্ঠার আঁচ করতে পারবে এবং তাঁর সৌরভ পাবে তখন জেনো যে, তোমরা তাকে পেয়ে গেলে আর এটি এমন একটি রহস্য যা শুধু সত্য সন্ধানীদের সামনেই প্রকাশ পায়।

অতএব ইনি-ই তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের মনিব যিনি নিজ গুণে সম্পূর্ণ আর সকল উৎকর্ষ গুণাবলী এবং প্রশংসার সমাহার। তাঁকে সেই চিনতে পারে যে সূরা ফাতিহা সম্পর্কে গভীর ভাবে প্রণিধান করে আর ব্যথিত হৃদয়ে খোদা তা'লার কাছে সাহায্য যাচনা করে। যারা আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করার সময় নিজেদের ইচ্ছা ও

অভিপ্রায়কে পরিশুদ্ধ করে এবং তাঁর সাথে বয়আতের অঙ্গীকার করে আর নিজেদের জীবনকে সকল প্রকার হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করে তাদের জন্য এ সূরার দ্বার খুলে দেয়া হয়। আর তারা তখনই দৃষ্টিশক্তি লাভ করে'। {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কৃত তফসীর, ১ম খন্ড- পৃষ্ঠা: ৭১-৯৬}

অতএব আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর এই মর্যাদা লাভে আমাদের সদা সচেষ্ট থাকতে হবে এবং লাভ করতে হবে। সূরা ফাতিহা এবং পুরো কুরআন সম্পর্কে প্রণিধানের পথও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিখানো বা দেখানো পথ অনুসরণেই আমরা পেতে পারি। তাঁর ইচ্ছা ও বাসনা অনুসারে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর বুৎপত্তি অর্জন করে আমরা যেন নিজেদের জীবনকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে সাজাতে পারি, এটিই আল্লাহ্‌র সমীপে আমার দোয়া।

আজকে আমি নামাযের পর দু'টো গায়েবানা জানাযা পড়াবো। প্রথম জানাযা হচ্ছে, সাবেক এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মরহুম আহমদ খাঁন নাসীম সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া ফাতেহ বেগম সাহেবার। জনাব আহমদ খাঁন নাসীম সাহেব অনেক পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর স্ত্রী গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । মরহুমা খুবই পুণ্যবতী, পাঁচ বেলার নামায ছাড়াও দোয়া এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত একইসাথে খোদাভীরু ও নিষ্ঠাবান নারী ছিলেন। রীতিমত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমি পূর্বেই বলেছি, তাঁর স্বামী জনাব আহমদ খাঁন নাসিম সাহেব এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মোকামী ছিলেন। সচরাচর গ্রাম্য জামাতগুলো এর আওতাভূক্ত বা এমন অনেক জেলা এর আওতাভূক্ত যেখানে গ্রাম্য জামাতের সংখ্যা বেশী। ঝং এবং সারগোধা, রাবওয়ার নিকটবর্তী হবার কারণে সেখানকার আহমদীরা অধিকাংশ সময় রাবওয়ায় আসতেন আর হযরত মৌলভী সাহেবের ঘর তাদের কাছে নিজের ঘর মনে হতো।

তাঁর ছেলে লিখেছেন, বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক সময় পঞ্চাশ জনের কাফেলা এসে যেতো যাদের ভেতর পুরুষ মহিলা উভয়ই অন্তর্ভূক্ত থাকতো। আর তিনি হাসিমুখে তাদের আতিথেয়তা করতেন। এমন মানুষ আগাম সংবাদ না দিয়ে হঠাৎ করে আসেন আর বিশেষ করে আমাদের সমাজে মানুষ নিয়ম-কানুনও জানে না। যাহোক তাৎক্ষণিকভাবে সবার জন্য গরম গরম খাবার প্রস্তুত করা হতো। কখনো তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করেন নি যে, এরা এভাবে না জানিয়ে কেনো আসে। আর এভাবে তাদের সাথে একটি যোগাযোগ স্থাপিত হয় আর মৌলভী সাহেবের ইন্তেকালের পরও সেই সম্পর্ক বহাল ছিলো আর তাদের ঘরে মানুষের যাতায়াত অব্যাহত থাকে। দরিদ্রদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। সন্তানদের কাছ থেকে কখনো কিছু নেন নি কিন্তু তাদেরকে সদা বলতেন, গরীবদের দাও। হাতে যে পয়সাই থাকতো গরীব, ফকীর এবং এতীমদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। বলেন যে, তাঁর ঘরে গরীবদের লাইন লেগে থাকত। মহিলারা তাঁর কাছে এসে সুখ-দুঃখের কথা বলতো। সবচেয়ে বড় গুণ ছিলো, খিলাফতের প্রতি তাঁর পরম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিলো আর সন্তানদেরও একই উপদেশ দিতেন। তাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন আর এ উদ্দেশ্যে সর্বদা তিনি চেষ্টিত ছিলেন। তিনি মুসী ছিলেন, খোদা তা'লা তাঁর রূহের মাগফিরাত করুন এবং জান্নাতে তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

মরহুমা তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন, যাদের মাঝে এক ছেলে তাঁর কাছে ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে দেশের বাহিরে আছেন, তাঁরা হলেন জনাব নাসের পরওয়াযী এবং জনাব নাসীম মাহদী; যিনি আমেরিকাতে আমাদের মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করছেন। পরওয়াযী সাহেব এবং নাসীম মাহদী সাহেব কোন কারণে জানাযায় যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও সহ্য শক্তি দান করুন। আমাদের মুবাল্লেগ নাসীম মাহদী সাহেবের পক্ষে তাঁর মায়ের দোয়া কর্মক্ষেত্রে অনেক কাজ দিয়ে থাকবে নিশ্চয়। ভবিষ্যতেও তাঁরা তাঁর দোয়ার কল্যাণ লাভ করুন এটিই আল্লাহ্‌র কাছে আমার দোয়া থাকবে।

দ্বিতীয় গায়েবানা জানাযা মরহুমা হাকিম বীবী সাহেবার যিনি পাকিস্তানের সাবেক মুয়াল্লেম ইসলাহ্ ইরশাদ জনাব গোলাম রসূলের স্ত্রী। প্রায় একশ' বছর বয়সে ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তিনিও অত্যন্ত পূণ্যবতী একজন মহিলা ছিলেন। দোয়া ও খোদার উপর নির্ভর বা তাওয়াক্কুল ছিল তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। চরম দারিদ্র সত্ত্বেও অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে স্বামীর সঙ্গ দিয়েছেন, আত্মসম্মানবোধ ছিলো প্রবল।

অসচ্ছলতা সত্ত্বেও কখনো কারো কাছে হাত পাতেন নি। ভাল পোষাক পরিধান করতেন। স্বল্পের ভেতর ভালো জীবন যাপনের চেষ্টা করতেন। ২৮ বছর পর্যন্ত রসূল নগরে ছিলেন। সেখানে জামাতের কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় অতিথিদের আনাগোনা লেগেই থাকতো আর অন্যান্য মেহমানও আসতো, তাঁর ঘর অতিথিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। একান্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের আতিথেয়তা করতেন।

১৯৭৪ এর অশান্ত যুগে ঘরে কেবল বাচ্চা ও মহিলারা ছিলো কোন পুরুষ ছিলো না। ঘরের বাহিরে মাচায় বসে সারা রাত জেগে দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে পাহারা দিতেন। তার ভেতর জামাতী ও ধর্মীয় আত্মাভিমান ছিল অত্যন্ত প্রবল। সেই বিশৃঙ্খল যুগে মানুষ পরামর্শ দিয়েছিলো, ঘরের বাহিরে আহমদীয়া লাইব্রেরী লেখা সাইন বোর্ডটি খুলে ফেলা হোক কেননা এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তিও লিখা আছে। তিনি বলেন, এটি এভাবেই লাগানো থাকবে কারো ভয়ে আমরা নিজ হাতে এটি নামাবো না।

তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট হিসেবেও ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। আহমদী ও গয়ের আহমদী ছেলে-মেয়েদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নির্দেশ দিতেন। তিনি তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। তার এক ছেলে ওয়াকফে যিন্দেগী জনাব মোবারক আহমদ জাফর লন্ডনে এডিশনাল উকিলুল মাল হিসেবে কাজ করছেন। আর দ্বিতীয় ছেলে জনাব মোবাশ্বের আহমদ জাফর সাহেবও অবসরোত্তর জীবন উৎসর্গ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দিন এবং মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আমি পূর্বেই বলেছি, (নামাযের পর) তাঁদের গায়েবানা জানাযা পড়ানো হবে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

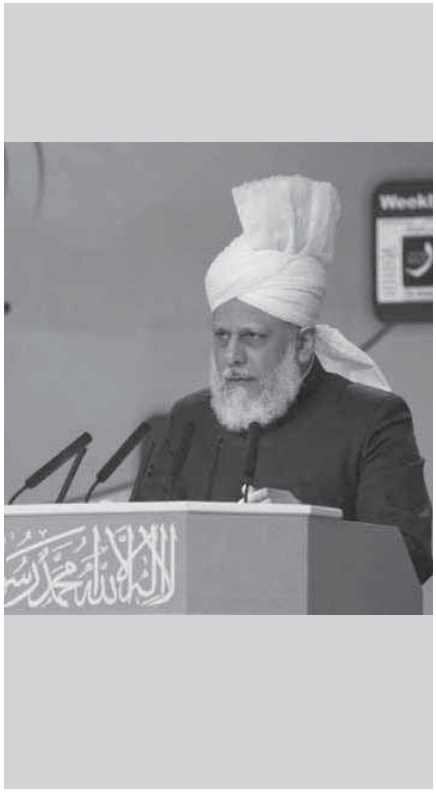

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২-এর (৩ তবলীগ, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (সূরা আন্ নাহল: ১২৯)

এ আয়াতের অনুবাদ হলো, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্ম পরায়ণ'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'পবিত্র কুরআনে সকল আদেশ-নিষেধের মধ্যে তাক্বওয়া এবং ন্যায়পরায়ণতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে'।

অতএব তাক্বওয়া হচ্ছে সেই মৌলিক বিষয় যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে থাকে। আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তা আপনারা সবাই শুনেছেন আর আমি এর অনুবাদও বলে দিয়েছি। আল্লাহ্ বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে থাকেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে। এখানে প্রথম কথা বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা সে পথ অবলম্বন করে যা তাক্বওয়ার পানে নিয়ে যাবার পথ। অতএব এরফলে এটিও পরিস্কার হয়ে গেল যে পৃথিবীতে দু' ধরনের মানুষ আছে। এক তারা, যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে সকল প্রকার পুণ্যকর্ম বা ভাল কাজ করার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় প্রকার মানুষ তারা, যারা কিছু ভাল কথা ও ভাল কাজ করে ঠিকই কিন্তু তাদের দৃষ্টিপটে খোদা থাকেন না। অথবা প্রত্যেক কাজের সময় তারা একথা চিন্তা করে না যে, আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন, আমাদেরকে দেখছেন। দ্বিতীয় প্রকার মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা খোদার সত্তায় বিশ্বাস রাখে অথবা নিদেনপক্ষে এতটুকু বিশ্বাস করে, একজন খোদা আছেন যিনি এই পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। কিন্তু কোন কাজের বেলায় বা কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কথা চিন্তা করে না। কোন ভাল কাজ করলেও তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা করে না।

এছাড়া আরেক দল আছে যারা আদৌ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্‌র সত্তায় বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এই দু'প্রকার মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলছেন, আমি তাদের সাথে থাকি না বরং আমি প্রথম প্রকার লোকদের সাথে থাকি যারা তাক্বওয়ার পথে চলে। কিন্তু আল্লাহ্‌র 'রবুবিয়্যত' সিফত বা প্রতিপালনের বৈশিষ্ট্য এমনই যে, যারা তাক্বওয়ার পথে চলে না তাদেরকেও বিভিন্ন জিনিষ ও নিয়ামতরাজি থেকে ততটাই অংশ প্রদান করেন যতটা একজন খোদাভীরুকে দেন। তবে এ অংশ কেবল ইহ জাগতিক জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যেমন সূর্যের আলো, বাতাস; এগুলো থেকে একজন মু'মিন ও খোদাভীরু যতটা কল্যাণ লাভ করে এক নাস্তিকও ততটাই লাভ করে। অনুরূপভাবে অন্যান্য জাগতিক বিষয় যেমন বিজ্ঞানের উন্নতি বা আধুনিক জ্ঞান, বিভিন্ন গবেষণা, নব্য আবিস্কারাদি ইত্যাদির জন্য মেধা খাটিয়ে এবং পরিশ্রম করে একজন নাস্তিকও ততটাই ফল পাবে যতটা একজন খোদাভীরু বা ন্যায়পরায়ণ লাভ করবে।

উদাহরণ স্বরূপ কৃষী কাজ বা চাষাবাস করে এক নাস্তিক ও লাভবান হয় আর একজন মুত্তাকীও। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে না বা নাস্তিক অথবা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাদের উপর যদি আল্লাহ্ তা'লার রবুবিয়্যত ও রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্য কার্যকর না থাকতো তবে এক মুহূর্তের তরেও জীবনধারণ তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যেতো। অতএব পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য দু'টি পথ খোলা রেখেছেন অর্থাৎ একটি পথ পুণ্যের আরেকটি পাপের। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর মানুষকে কতক

নিয়ামত সমভাবে দান করেছেন।

যাহোক এ বিষয়টি এখানে সুস্পষ্ট যে, প্রকৃতির নিয়ম সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি এটিও স্পষ্ট করে দিতে চাই, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে একই পরিস্থিতিতে কোন কোন সময় মু'মিন মুত্তাকীর প্রচেষ্টায় বেশি ফল দিয়ে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ বাহ্যতঃ একই ধরনের ক্ষেতে একই ধরনের ফসল দেখা গেলেও দোয়ার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন বেশি হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন সিন্ধু প্রদেশে জমি চাষাবাদ করাচ্ছিলেন তখন প্রাথমিক পর্যায়ে দেখাশোনার জন্য জামাতের বুযুর্গদেরও পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন, হযরত মৌলভী কুদরত উল্লাহ্ সানওয়ারী সাহেব (রা.)। ইতিপূর্বেও একবার আমি এ কথা উল্লেখ করেছি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার সে এলাকায় সফরে যান, ফসল দেখছিলেন, সেবার কার্পাস চাষ করা হয়েছিল।

হযরত মৌলভী সাহেব, যিনি একজন সাহাবীও ছিলেন তাঁর কাছে তিনি (রা.) জানতে চান, উৎপাদন আনুমানিক কতটা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? তিনি তাঁর অনুমানের কথা বললেন। সেখানে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এবং অন্যরাও ছিলেন, যাদের মতে এ অনুমান ভুল ছিল। তারা বলছিলেন, হযরত মৌলভী সাহেব একটু বাড়িয়েই বলছেন। হযরত মৌলভী সাহেব তাদের কথা শুনে ফেলে বলেন, মিয়াঁ সাহেব! আমি যতটা অনুমান করেছি, ইনশাআল্লাহ্ কমপক্ষে অবশ্যই ততটা হবে। কেননা আমি এ ক্ষেতের চার কোনাতেই নফল নামায পড়েছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, আমার নফল উৎপাদন অবশ্যই বৃদ্ধি করবে। বাস্তবে উৎপাদন ততটাই হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা একই আবহাওয়া আর ফসলের জন্য একই ধরনের সার বীজ ইত্যাদি ব্যবহারের পরও দোয়ার মাধ্যমে আপন অস্তিত্বের প্রমাণ দেন এবং উৎপাদন বাড়িয়ে দেন।

জাগতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রেও একজন মুত্তাকী আল্লাহ্ তা'লার সাহচর্যের প্রমাণ পেয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ ঈমান রাখেন বস্তুজগত ছাড়া তাদের জন্য একটি আধ্যাত্মিক জগতও রয়েছে, যার স্বাদ বস্তুবাদী মানুষ পায় না আর তা সম্ভবও নয়। তাক্বওয়ার পথে পরিচালিতদের চিন্তা-চেতনা অনেক উঁচুস্তরের হয়ে থাকে। এ জগতের ঊর্ধ্বে থেকে তারা চিন্তা করেন। আর তারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনেন এবং পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিতে তাদের পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। দোয়ার জন্য হাত উঠালে তারা দোয়া গৃহীত হওয়ার নির্দশন দেখেন। এ যুগে আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সত্যিকার সম্পর্ক গড়ার রীতি শিখিয়েছেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)। এমন অনেক আহমদী রয়েছেন, যারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের বাস্তব অভিজ্ঞতা রাখেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক থাকায় সত্যস্বপ্ন, দিব্যদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাদের বলেন, এভাবে হবে আর বাস্তবে হুবহু তেমনই ঘটে থাকে। সঙ্গে থাকার এটিও একটি অর্থ, আল্লাহ্ তা'লা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে যে পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন তাও পূর্ণ হবে। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষ যদি তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে তারা এ জগতেও পুরস্কৃত হবে এবং পরকালেও।

অতএব মুত্তাকী যখন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে তখন সে ইহ ও পরকাল অর্থাৎ উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করে, এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা সৎকর্ম করে তারাই মুত্তাকী। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এমন সৎকর্মশীল মানুষ, যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্ম বা নেক কাজ করে তারাই কেবল তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিন্ন ধরনেরও কিছু লোক আছে যারা পুণ্যকর্ম বা সৎকর্ম করে ঠিকই কিন্তু তা খোদা তা'লার খাতিরে করে না। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুত্তাকীর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সে অনুসারে প্রত্যেক ছোট-বড় গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক আর কেবল মন্দকর্ম থেকে বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয় বরং পুণ্যকর্মে এবং উন্নত নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ হওয়াও আবশ্যক। এছাড়া খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাও আবশ্যক। কোন এক ব্যক্তির মাঝে এ বিষয়গুলো থাকলেই সে মুত্তাকী আখ্যায়িত হতে পারে। খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার বিশ্বস্ততা রক্ষার অর্থ কী? তা হলো, যথাযথভাবে তাঁর ইবাদত করার চেষ্টা করা আর যতদূর সম্ভব তাঁর নির্দেশাবলী শিরোধার্য করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করা। অবস্থা যদি এরূপ দাঁড়ায় তাহলে কি হয় তা আল্লাহ্ তা'লা একই আয়াতে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ তাক্বওয়ার পরের ধাপের উল্লেখ করেছেন।

বলেছেন, وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ । মুহসিনের অর্থ হল, কাউকে পুরস্কৃত করা। কারো কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছাড়াই তাকে দেয়া। এমন দানশীলদের মুহসিন বলা হয়। এছাড়া মুহসিনের আরেকটি অর্থ হলো, নিজের কাজের ক্ষেত্রে পরাকাষ্ঠা অর্জন। নিজ কর্ম সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান লাভ করা আর স্থান, কাল ও পাত্রভেদে প্রতিটি কর্ম সর্বোত্তমভাবে সম্পাদন করা। মোটকথা মুহসিন দু'ধরনের হয়ে থাকে, প্রথমতঃ যে অন্যের প্রতি মমতার বশবর্তী হয়ে তাদের সেবার নিমিত্তে সদা প্রস্তুত থাকে। কে কোন্ ধর্ম, সম্প্রদায় এবং জাতিভূক্ত তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তার সেবায় নিয়োজিত হয়। তাদের লক্ষ্য একটিই– আমরা মানব সেবা করবো। এছাড়া প্রয়োজনে অন্যের সেবায় এগিয়ে আসা আর যতটা সম্ভব অন্যের কাজ সহজ করা।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক, এ চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে মানবতার সেবা করা। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ চেতনার সাথে অনেক এমন আহমদী আছেন যারা মানবতার সেবা করেন। তারা মুহসিন ঠিকই তবে সেবা করার পর খোঁটা দেন না। তারা মুহসিন হতে পারে না যারা অনুগ্রহ করার পর খোঁটা দেয়। কেননা, যদি খোঁটা দিয়ে বসে তাহলে তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না। অতএব খোদাভীরুতা তখন প্রকাশ পাবে যদি অনুগ্রহ করে খোঁটা দেয়া না হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের ইঞ্জিনিয়াদের নিন, তারা স্বেচ্ছাসেবা দিতে যায়। যুবকরা রয়েছে, ডাক্তাররা আছেন অথবা

অন্যান্য পেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ

আছে। উদাহরণস্বরূপ আফ্রিকাতে অনেক প্রজেক্টের কাজ চলছে, এসব প্রজেক্টে তারা কাজ করতে যান, স্থানীয় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে হস্ত চালিত পাম্প লাগাচ্ছেন। বিদ্যুত সরবরাহের চেষ্টা করছেন। তাদের জন্য স্কুল নির্মাণ করছেন যাতে তাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়। ক্লিনিক এবং হাসপাতাল নির্মাণ করছেন যেন স্বাস্থ্য-সেবা সুনিশ্চিত করা যায়। যেন এগুলোর মাধ্যমে তাদের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয় তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করা যায়। এছাড়া আমাদের শিক্ষকগণ এবং ডাক্তাররা বছরের পর বছর সেখানে অবস্থান করে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিকূল পরিবেশে তারা সেখানে অবস্থান করেন।

কতক এমন স্থানও আছে যেখানে বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই তাসত্বেও সেখানে গিয়ে তারা অবস্থান করেন। সেবার প্রেরণা নিয়ে থাকেন। সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হবার মানসে তারা সেখানে যান।

অতএব এ সেই সেবা এবং পুণ্য যা কোন বিনিময়ের আশায় নয় বরং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ভীতি হৃদয়ে ধারণ করে মানব সেবার জন্য করা হয়।

অনুরূপভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে প্লাবন এবং ভুমিকম্প ইত্যাদি হচ্ছে সেখানেও আমাদের ডাক্তার ও সেচ্ছাসেবকরা হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর তত্বাবধানে সেবা প্রদান করে থাকেন। অন্য কোন লোভে নয় বরং শুধুমাত্র তারা সেখানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যায়। আরো অনেক মানুষ আছে যারা সেবা করছে ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নয়।

মোটকথা যারা সেবা করছে, সদ্ব্যবহার করছে, স্বীয় জ্ঞান ও কর্মদ্বারা অন্যদেরকে উপকৃত করছে আর তারা কেবল খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে করছে তারাই মুত্তাকী এবং সৎকর্ম পরায়ণ। যেভাবে আমি পূর্বেও এক খুতবায় বলেছি, আহমদী প্রকৌশলীরা বুর্কিফাসুতে একটি 'আদর্শ গ্রাম' বানিয়েছে যেখানে বিদ্যুৎ এবং পানির সুব্যবস্থা রয়েছে। পাকা ফুটপাথ, স্ট্রীট লাইট, কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে যা স্থানীয় চাহিদা মেটাবে অর্থাৎ যেখানে সবাই একত্রিত হয়ে নিজেদের অনুষ্ঠানাদি করতে পারে। এভাবে ছোট্ট গ্রীন হাউস আছে যেখানে শাক-সবজি ইত্যাদি লাগানো হয় যা স্থানীয় প্রয়োজন মেটাতে পারে। এর জন্য পানির যোগান দিতে হয় এছাড়া বিভিন্ন গ্রামে আমাদের লোকজন হ্যান্ড পাম্প লাগাচ্ছেন। এ কাজ সম্পন্ন হবার পর স্থানীয় জনগণের আনন্দ দেখার মত হয়ে থাকে। যখন তারা এর ছবিগুলো এখানে নিয়ে আসেন তখন বুঝা যায় যে, কত বড় কাজ ছিল।

তারা বলেন, আমরা একে সাধারণ কাজ মনে করেছিলাম কিন্তু স্থানীয়দের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের চেহারায় আনন্দ আর ধরে না কেননা, ৮/১০বছর বয়সের বালককে পাঁচ মাইল দূর থেকে মাথায় করে বালতি ভরে পানি নিয়ে আসতে হতো। তাদের জন্য এটি এক নিয়ামত কেননা, তারা ঘরে বসেই খাবারের জন্য বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে। এ কাজগুলো কোন কিছুর বিনিময়ের লোভে করা হচ্ছে না আর কখনো এ কাজের জন্য খোঁটাও দেয়া হয় না। বরং আমাদের যুবক এবং ইঞ্জিনিয়াররা যখন কাজ শেষে সেখান থেকে ফেরত আসেন তখন তারা যাবার সুযোগ দেয়ার জন্য আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আর এ অঙ্গীকারও করেন, আমরা আগামীতেও যাবো ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

এ বছর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিভিন্ন দেশে পাঁচটি 'আদর্শ গ্রাম' বানানো হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের অংগ-সংগঠন যাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের আনসারুল্লাহ্ পুরো ব্যয় বহন করার দায়িত্ব নিয়েছে। এভাবে হিউমিনিটি ফার্স্টও এতে কিছুটা অংশ নিয়েছে। এই মর্মে জার্মানী জামাতকেও আমি ভূমিকা রাখতে বলেছি।

অতএব কর্মীদের সেবার এই চেতনাই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপভাবে যারা এ সেবার জন্য অর্থ সরবরাহ করে তারাও এই পুণ্যের ভাগীদার সাব্যস্ত হয়। একজন আহমদী যে যুগ ইমামকে মেনেছে, খোদাভীতির সাথে জীবন যাপনের অঙ্গীকার করে যতটুকু সম্ভব সেই তাক্বওয়ার পথে চলার চেষ্টা করে এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করে। তখন খোদা তা'লা বলেন, আমি এমন লোকদের সাথে আছি এবং সর্বদা তাদের সাথে থাকি। যখন আমাদের ছেলেরা যাদের কথা আমি বলেছি তারা এ কাজ করে ফেরত আসে তখন তারা নিজেরাই বলে, কাজের বেলায় অনেক সময় আমাদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে অথচ আল্লাহ্ তা'লা অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর স্বীয় কুদরতের মহিমা দেখিয়েছেন এবং এমনভাবে এর সমাধান করেছেন, যে অভিজ্ঞতা ছিল অভাবনীয়ভাবে ।

তারা বলে, এটি দেখে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায়। একইভাবে আমি যেমনটি বলেছি, মুহসেনীন তাদের বলা হয় যারা নিজেদের সংশোধনের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং নিজেদের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিকে উৎকর্ষতা দানের চেষ্টা করে। পুণ্য কাজকে নিজেদের জীবনের বৈশিষ্ট্য বানানো আর এক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি করা। আর সেই সাথে জ্ঞান ও তত্ত্বে সজ্জিত হয়ে লব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ এবং এর মাধ্যমে অন্যদের উপকার সাধন করা। জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি যত বৃদ্ধি পাবে এবং এর সাথে অপরের হিতসাধনের চেষ্টা করা হলে এর মাধ্যমে মুহসেনীনদের অন্তর্ভূক্ত হবার ক্ষেত্রে আর এক ধাপ মানুষ উন্নতি করে, মানুষ আরো এগিয়ে যায়, একটি নতুন রাস্তা নির্ণয় হয় যা তাকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির পানে নিয়ে যায়।

এই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির ফলে, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গ লাভের নিত্য নতুন আঙ্গিকও দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নৈকট্যের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। তাঁর গুণাবলীর বুৎপত্তি লাভ হয়- ফলে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়। যেন একটি চক্র বা একটি বৃত্ত যা পুণ্যের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে তাক্বওয়ার উচ্চ মার্গে উপনীত করে আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত নিয়ে যায়। আবার খোদা তা'লার পক্ষ থেকে শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরপর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সামর্থ বৃদ্ধি পায় আর

পুণ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। আর এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকার প্রদানের সমধিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

অতএব এ হলো সেই অনুগ্রহ যার মাধ্যমে বান্দা মুহসেন হয় আর যা আল্লাহ্ তা'লা একজন মানুষকে বানাতে চান, যারা অনুগ্রহের খোঁটা দেয় না বরং অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের কষ্টের মুখে ঠেলে দেন এবং আপন স্বার্থ ছেড়ে দেন। তারা যে নীতির অনুসরণ করেন

তাহলো, নিজের অধিকার আদায়ের জন্য নয় বরং অন্যের অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি দাও। অ-আহমদীদের সামনে বা যেসব নেতৃবর্গ সাক্ষাত করতে আসে তাদের সামনে অথবা দুনিয়াদার মানুষ যারা ইসলামের উপর আপত্তি করে বা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে যারা সম্পূর্ণভাবে অবহিত নয় এমন অ-আহমদীদের সামনে আমি প্রায়শঃ এ বিষয়টি উপস্থাপন করে থাকি, দুনিয়ার লোকেরা অধিকার আদায়ের প্রতি পুরো জোর দেয়। আর নিজেদের অধিকারের একটি মিথ্যা মান নির্ধারণ করে তা অর্জনের জন্য যাচ্ছেতাই করে। ফলশ্রুতি যা দাঁড়ায় তাহলো, অধিকারের দাবীকারীও ন্যায়নীতি ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে না আর প্রাপ্য প্রদানকারীও ন্যায়নীতি ও খোদাভীতি অবলম্বন করে চলে না। এতে মুসলমান অমুসলমান উভয় গোষ্ঠীই অন্তর্ভূক্ত। আর এরফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় অথচ মুসলমানদের উচিত ইসলামের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এর উপর যদি আমল করে তাহলে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে নৈরাজ্য বিদ্যমান, কমপক্ষে মুসলিম দেশগুলোতে যে নৈরাজ্য বিরাজমান– তা কখনো হতো না।

ইসলামের শিক্ষা হলো, অন্যের অধিকার প্রদান করো। কেউ অধিকার চাওয়ার পূর্বেই তার অধিকার প্রদান করো। বরং তার প্রতি অনুগ্রহ করে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। তাদের প্রয়োজনের প্রতি তাদের তুলনায় বেশী যত্নবান হও। যেমন কর্মচারী ও সেবকদের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, তুমি যা পরিধান কর গরীব কর্মচারীকেও তা-ই পরিধান করাও। তুমি যা খাও তাকেও তা-ই খাওয়াও। বিশ্বের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এই শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে কোন দেশের জনগণ ক্ষুধার্ত থাকতে পারে না, তাদের অধিকার কখনো খর্ব হতে পারে না, তারা বস্ত্রহীন থাকবে না। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের দৃশ্য টেলিভিশনে দেখানো হয়। শিশুরা নিরন্ন জীবন যাপন করছে, অনেকে খাদ্যাভাবে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত বা সঠিকভাবে তাদের দৈহিক বিকাশ হচ্ছে না। পুষ্টিহীনতার শিকার মায়েরা ক্ষুধার্ত; কোলের শিশুকে দুধ দিতে পারেন না।

অতএব যদি সম্পদ করায়ত্ব করার চিন্তা পরিহার করে প্রাপ্য প্রদানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়, অনুগ্রহশীল বা মুহসেনীন হয়ে অন্যের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় এবং গরীবদেরকে স্বনির্ভর করা হয় তাহলে বিশ্বে মাথাচারা দেয়া বর্তমান সমস্যাবলী এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। যদি মুসলমান রাষ্ট্রগুলোও নিজেদের দেশে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং নেতৃবৃন্দ ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত করার পরিবর্তে জনগণের প্রতি যত্নবান হয়, সৎকর্মের প্রতি মনোযোগী হয় খোদাভীতির নীতি অনুসরণ করে, তাহলে এই অনুপম শিক্ষার বর্তমানে আমাদের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে কখনো এ অস্থিরতা, দারিদ্র, অভাব-অনটন ও দুরবস্থা হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলমান রাষ্ট্রগুলোতেই এ অবস্থা সর্বাধিক পরিদৃষ্ট হচ্ছে। অন্যরাও এ সুযোগকে লুফে নেয়। যখনই আমি লোকদের সামনে একথা বলেছি, যদি এ অবস্থা বিদ্যমান থাকে আর তোমরা যদি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করো তবে পৃথিবীতে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো আপনা-আপনি দূর হয়ে হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে অধিকাংশ লোক বলে থাকেন, প্রকৃত কথা এটিই এবং এটিই ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা। কিন্তু তারা যখন নিজেদের বৈঠকে ফেরত যায়, তখন তাদের ব্যক্তিস্বার্থ সমূহ এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় স্বার্থের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যায়। জাতীয় স্বার্থ অবশ্যই দেখা উচিত, যদি তা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দেখা হয় কিন্তু অন্যের অধিকার খর্ব করে নয়– তবে অবশ্যই তা করা যায়। এটি জানা কথা, প্রথমে মানুষ যেভাবে নিজের স্বার্থ দেখে, তেমনি রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। কিন্তু অন্যের সম্পদ করায়ত্ত করার জন্য দেশীয় স্বার্থকে ব্যবহার করা একটি ভ্রান্ত রীতি। অন্যের স্বার্থ খর্ব করে নিজের নাম সর্বস্ব অধিকার লাভের চেষ্টা করা খুবই অন্যায়। এসব বিষয় স্বার্থপরতার অন্তর্ভূক্ত। এসব বিষয় কেবল বিশৃঙ্খলাকেই উসকে দিয়ে থাকে।

যাহোক প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো, তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে আল্লাহ্

তা'লার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা। এর মাধ্যমেই আমরা আত্ম সংশোধন করতে পারব এবং সমাজকেও আমাদের সীমিত গন্ডীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করতে পারব।

'সিবগাতুল্লাহ্' কে সামনে রেখে আমাদের উচিত সামর্থ ও সাধ্য অনুযায়ী নিজেদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ধারণের জন্য চেষ্টা করা। বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ দেয়া ও সদা এর জন্য প্রস্তুত থাকা। তাহলে পার্থিব এসব নিয়ামত আমাদের সেবক হয়ে যাবে। আমাদের জীবনে এসব পার্থিব জিনিষের গুরুত্ব গৌণ হয়ে যাবে আর সেই সুফল আসবে অর্থাৎ যদি মানুষ বিশুদ্ধচিত্তে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার জন্য এসব কাজ করে তাহলে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করবে। মোটকথা যে দৃষ্টিকোন থেকেই আমরা দেখি না কেন, আমাদের চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি।

আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহকারীদের বা সৎকর্মশীলদের কীভাবে পুরস্কৃত করেন এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের একস্থানে বলেছেন,

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(সূরা আল্ বাকারা:১১৩)

অর্থাৎ জেনে রাখো, যে ব্যক্তি সদাচারী হয়ে খোদা তা'লার নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তার প্রভুর নিকট তার জন্য প্রতিদান রয়েছে। তারা ভীতও হবে না এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যখন তোমাদের চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হবে একমাত্র আমার সত্তা এবং তোমরা কেবল আমার-ই চতুপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করবে, আমার সন্তুষ্টি যদি তোমাদের মূল লক্ষ্য হয়। একজন তাক্বওয়াশীল বান্দা যখন পুরোপুরি খোদা তা'লার সমীপে আত্মসমর্পণ করে তখন খোদা তা'লা স্বয়ং তার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান, তার সব দুঃশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তার সব কিছু খোদা তা'লার নিকট সমর্পণ করে আর তাঁর দরবারে বিশুদ্ধচিত্তে বিনত হয় তখন তার সব দুঃশ্চিন্তা ও ভয় অমূলক হয়ে যায়। অনুগ্রহশীল হিসেবে নিজের

সমস্ত যোগ্যতাকে সৃষ্টির সেবা এবং মানব সেবায় নিয়োজিত করে; তার কীসের দুঃখ, কিসের ভয়? এ দু'টি কাজ এমন যা বান্দাকে খোদা তা'লার স্নেহের ক্রোড়ে স্থান দেয়। এটিই প্রকৃত খোদা ভীতির পরিচয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, 'বড় বড় পাপ যেমন ব্যভিচার, চুরি, অন্যের অধিকার হরণ, লোক দেখানো, আত্মশ্লাঘা, তুচ্ছতাচ্ছিল করা এছাড়া কৃপণতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা, নীচ অভ্যাস পরিত্যাগ করে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করা মুত্তাকী (খোদা ভীরু) হবার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত। মানুষের প্রতি মহানুভব হওয়া, উত্তম ব্যবহার ও সহানুভূতি প্রদর্শন এবং খোদা তা'লার প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করা।

খোদা তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত মাকামে মাহমুদকে অন্বেষণ করা। এই গুণাবলী থাকলেই মানুষ মুত্তাকী (খোদা ভীরু) আখ্যা পায়, আর যাদের মাঝে এ গুণাবলীর সমাহার ঘটে তারাই প্রকৃত মুত্তাকী সাব্যস্ত হয়'। অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন কোন গুণ যদি কোন একজনের মাঝে পরিদৃষ্ট হয় তবে সে মুত্তাকী নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমষ্টিগত ভাবে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী তার মাঝে না থাকবে। 'আর এসব মানুষের জন্যই لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ প্রযোজ্য অর্থাৎ তাদের কোন ভয় নেই আর তারা চিন্তিতও হবে না। এরপর তাদের আর কী চাই? আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের অভিভাবক হয়ে যান যেমন তিনি বলেছেন, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

(সূরা আল্ আ'রাফ: ১৯৭)

অর্থাৎ তিনি পুণ্যবানদের সঙ্গ দেন আর তাদের অভিভাবক হন।

তিনি (আ,) বলেন, 'হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের হাত হয়ে যান, যা দিয়ে তারা ধরে। তাদের চোখ হয়ে যান যদ্বারা তারা দেখে। তাদের কান হয়ে যান যা দিয়ে তারা শোনে। তাদের পা হয়ে যান যদ্বারা তারা চলে। আর অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে আমার বন্ধুর শত্রুতা করে তাকে বলি, আমার সাথে যুদ্ধের জন্য জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। অন্যত্র বলেছেন, যখন কেউ খোদা

তা'লার বন্ধুর উপর আক্রমণ করে খোদা তা'লা তাকে সেভাবে আক্রমণ করেন যেভাবে কেউ বাঘিনীর বাচ্চা ছিনিয়ে নিতে চাইলে সে হুংকার দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে'।

অতএব কতইনা সৌভাগ্যশালী তারা যাদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ্! আর খোদা তা'লা যাদের বন্ধু হয়ে যান– তাদের দুঃখ ও ভয় এমনিতেই উবে যায়। ভবিষ্যতে পুণ্যকর্ম করার প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। বিগত দিনের কোন মন্দকর্ম থাকলেও সেটি ক্ষমা হয়ে যায়। মানুষের নিজেদের ভবিষ্যতের বিষয়ে চিন্তা থাকে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে অনেকেই এ্যাসাইলাম করেছেন। তাদের সব সময় দুঃশ্চিন্তা থাকে, জানি না রায় কি হবে? এই ভয়ের কারণে আমি অনেকের ওজন কয়েক কিলোগ্রাম কমে যেতে দেখেছি। সাক্ষাতের সময় তাদের চেহারা মলিন দেখায়। কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে এজন্য উদ্বিগ্ন ও ভীত যে জানা নেই আগামীতে কি হবে? ছাত্ররা পরীক্ষার কারণে ভীত থাকে।

মোটকথা ভবিষ্যতের চিন্তা মানুষকে একটা ভয়ের মধ্যে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত এর ফলাফল প্রকাশিত না হয়।

এভাবে দুঃখ-বেদনা, যা অতীত ঘটনাবলীর কারণে হয়ে থাকে। মানুষ যত বেশি দুঃখ পায় ততই সে দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে। অনেক বস্তুবাদী মানুষ নিজেদের ব্যবসায়িক ক্ষয়-ক্ষতির কারণে এতটাই দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়, স্থায়ীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অনেকের হৃদয় এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, স্থায়ীভাবে সয্যাশায়ী পড়ে পড়ে বা দুনিয়া থেকেই চলে যায়। যাহোক একজন মু'মিন-মুত্তাকী ও সদাচারী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদের কোন ভয় নেই আর কোন দুঃখ নেই। একজন ধার্মীক মানুষ যার খোদা তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রয়েছে আর সেভাবে যে জীবন যাপনের চেষ্টা করে, সে কখনো জাগতিক দুঃখ-বেদনার কাছে পরাজিত হয় না। পুণ্যবানদের জীবনেও যে ভয়-ভীতি এবং দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তা জাগতিক দুঃখ নয় বরং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের বেদনা হয়ে থাকে। তা খোদা তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাবার

ভয়ে হয়ে থাকে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক পংক্তিতে বলেছেন:

'অহর্নিশি এই চিন্তায়ই কাটে যে সেই বন্ধু কখন সন্তুষ্ট হবে'।

অতএব এটি হলো, বন্ধুকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা আর শঙ্কা। এই ভয় তাদের মনোযোগকে দোয়া এবং যিক্‌রে এলাহীর প্রতি অধিক নিবদ্ধ করে থাকে আর أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ -এর ধ্বনি তাদের সান্তনা দিয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লার স্মরণই তাদের হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হয়ে থাকে যা অতীত দুঃখকেও দুর করে আর ভবিষ্যতের ভীতি দূরীভূত হবার ব্যাপারে তাদেরকে আশ্বস্ত করে থাকে। তাক্বওয়ার পথে পদচারণাকারীদের ভীতি মূলতঃ প্রেম এবং ভালবাসার ভীতি হয়ে থাকে।

তাক্বওয়ার অর্থই হলো, এমন ভয় বা আকুলতা যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি

অর্জনের জন্য ব্যাকুল করে তুলে।

অতএব এই ব্যাকুলতাই হৃদয়ের দৃঢ়তার কারণ হয়ে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির কারণ হয়। জগতপূজারী মানুষের ব্যাকুলতা পক্ষান্তরে তাদের হৃদয়ের উপর আঘাত হানে। আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বনকারী ও সদাচারীরা আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানে যত্নবান হয় আর নিজের কর্মের প্রতিও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দেয় যার ফলে তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হয়।

অতএব দুনিয়াদার এবং ধার্মিক লোকদের দুঃখ ও ভীতির ভেতর মূলতঃ এটিই পার্থক্য। তাই এক জন আহমদীকে নিজের অবস্থায় এমন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করা আবশ্যক যা তাকে তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত করবে এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত বানাবে, যাতে আমরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভে সক্ষম হই আর যা আমাদেরকে ইহ ও পরকালের ভীতি থেকে নিরাপদ রাখবে। আমাদের যদি কোন দুঃখ থেকে থাকে তাহলে তা এমন হওয়া উচিত যা খোদা তা'লার ভালবাসাকে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাহলে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহও অধিক বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এতে আরও বৃদ্ধি পাবে। আমরা যদি খোদার ভালবাসার সঠিক মান অর্জন করতে পারি তাহলে সত্য সত্যই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাথী হবেন।

উদাহরণ স্বরূপ যেভাবে আমি বলেছি, অধিক বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখবেন, আমার বান্দা সৎকর্মশীল হয়ে উঠছে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমার বৈশিষ্ট্যাবলী আপন সত্তায় ধারণ করছে, আমি কেন তার প্রতি অনুগ্রহবারী বর্ষণ করবো না? আল্লাহ্ তা'লা এমনিতেই বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকেন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের বৃষ্টি যখন বর্ষিত হয় এরফলে শুধু এ জগতের চিন্তাই দূর হয় না বরং তাঁর অনুগ্রহ এবং পুরস্কারের সংকুলান কঠিন কয়ে যায়। প্রকৃত তাক্বওয়ার প্রতি একজন মু'মিনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উল্লেখ করেন, 'প্রকৃত তাক্বওয়ার সাথে অজ্ঞতার সংমিশ্রণ থাকতে পারে না। প্রকৃত তাক্বওয়া নিজের মাঝে একটি জ্যোতি রাখে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

(সূরা আল্ আনফাল:৩০)

وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ

(সূরা আল্ হাদীদ:২৯)

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা তাক্বওয়ার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো আর আল্লাহ্‌র খাতিরে মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে অবিচল ও অটল থাকলে খোদা তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করবেন।

সেই পার্থক্য হচ্ছে, তোমাকে একটি আলো দান করা হবে, যেই আলোর সাহায্যে তোমরা নিজেদের সকল পথ অতিক্রম করবে। এমনকি এই আলো তোমাদের সকল কাজে, কথায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আর ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করবে। তোমাদের বুদ্ধি হবে জ্যোতির্মন্ডিত। তোমাদের অনুমান ভিত্তিক কথা, তোমাদের চোখ, তোমাদের কান, তোমাদের জিহ্বা এবং তোমাদের বক্তৃতা এক কথায় তোমাদের সকল উঠাবসা বা গতিবিধিতে আলো থাকবে। আর যে পথে তোমরা যাতায়াত করবে সেই পথ আলোকিত হয়ে যাবে। এক কথায় তোমাদের সকল পথ যেমন অঙ্গপ্রতঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের পথগুলো জ্যোতিতে ভরে যাবে আর তোমরা সম্পূর্ণরূপে আলোতেই বিচরণ করবে'।

অতএব আল্লাহ্‌র বান্দা যখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয় বা হবার চেষ্টা করে তখন তার বিরোধীরাও আল্লাহ্ তা'লার হাতে ধরা পড়ে। আমরা যেন এই মান অর্জনকারী হই আল্লাহ্ তা'লার কাছে এটিই আমার দোয়া। যেখানে আমরা নিজেরা কল্যাণমন্ডিত হবো সেখানে কল্যাণের ভাগীও করতে পারবো আর বিরোধীদের হাত থেকেও আমরা রক্ষা পাবো। বিরোধীদের সকল প্রকার দুস্কৃতির কুফল তাদের উপরই আঘাত হানুক। আর অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে আমরা যেখানে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসাকে আকর্ষণ করতে পারবো, মানবতার নিঃস্বার্থ সেবা করতে পারবো ইসলামের বাণী পৃথিবীতে প্রচার করতে পারবো সেখানে আমরা আহমদীয়াতের বিরোধীদের ধরা পড়ার দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করবো, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর এবং সেসব দোয়া করার ও সেই মর্যাদা অর্জন করার তৌফিক দান করুন।

আজকেও আমি একটি গায়েবানা জানাযার নামায পড়াবো যা বেলুচিস্তানের হারনাইয়ের ডাক্তার আমের সাহেবের। তাঁকে গত ১লা ডিসেম্বর ২০১১ কতক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ক্লিনিকে প্রবেশ করে গুলি করে শহীদ করে। তাঁর শাহদতের খবর বেশ বিলম্বে এসেছে কারণ হলো, সেখানে জামাত নেই তাই সময়মতো জানা যায় নি আর তাঁর স্ত্রীও হারনাই হাসপাতালেই কাজ করতেন। তিনি কায়েদাবাদ জেলার খোশাবে জামাতভূক্ত হন। তিনি তাঁর বংশে একাই আহমদী আর এমনই এক সংগঠনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল যারা পাকিস্তানে নিজেদের উগ্রপন্থার জন্য কুখ্যাত আর তাদের দলের কেউ আহমদীয়াত গ্রহণ করবে এটি তারা কখনো মেনে নিতে পারতো না। যাহোক এটিও তাঁর শাহাদতের একটি কারণ হতে পারে।

এই পরিবারটি মুজাফফর গড়ে বসবাস করতো। ১৯৯৪ সালে তারা বয়আত করে। ১৯৯৮সালে তিনি বিয়ে করেন। তার দু'টি ছোট ছোট শিশু সন্তান রয়েছে। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান এবং সৎ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করুন এবং তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন, তাঁকে স্বীয় সন্তুষ্টির জান্নাতে স্থান দিন আর তাঁর পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

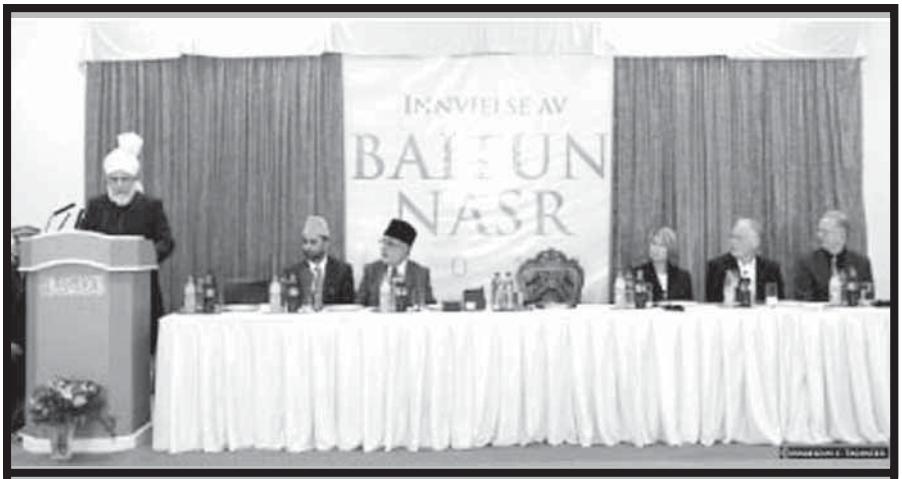

সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার উপরই বিশ্বের টিকে থাকা নির্ভর করছে

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)

অনুবাদ : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ মসজিদ "বায়তুন নছর'-এর উদ্বোধন হয়। নরওয়ের আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক নির্মিত এটাই প্রথম মসজিদ এবং সেদেশে এটা সবচে' বড় মসজিদ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। কেবল মসজিদটি-ই ৭৭৫৯ বর্গ মিটার জমির উপর নির্মিত হয়েছে। সর্বমোট ২২৫০ জন মুসল্লি একসাথে এ মসজিদে নামায আদায় করতে পারে। এর গম্বুজটির উচ্চতা পাঁচ মিটার এবং এর সংলগ্ন আঙ্গিনায় একটি গ্রন্থাগার, অফিস সমূহ এবং একটি বড় পাক-শালা রয়েছে। অসলো বিমান-বন্দরে যাবার রাজ পথের পাশেই মসজিদটি স্থাপিত।

প্রতিদিন প্রায় ৮০ হাজার মোটর গাড়ী ও অন্যান্য যান-বাহন এ মসজিদের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে। সন্ধ্যায় আহমদীয়া জামাত কর্তৃক একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যে অনুষ্ঠানে সরকারের উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পেশাদার ব্যক্তিগণ, প্রতিবেশী এবং স্থানীয় অধিবাসীদেরকেও আহমদীয়া জামাতের সদস্যগণ আমন্ত্রণ জানান। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এ সভার কাজ শুরু হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নরওয়ের জাতীয় প্রেসিডেন্ট জনাব জারতাস্ত মুনীর আহমদ খান এ প্রকল্পটি বাস্তাবায়নে সেখানকার আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর বিবরণ দান করেন। সুইডেনের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির উর্ধতন সদস্য মি: রোজার কালিফ মসজিদটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সুযোগ দানের জন্য হুযূর আনওয়ার হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিসেস গ্রীটি ফারেমো এ অনুষ্ঠানে নরওয়ে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি তার বক্তৃতায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেসকে স্বাগত জানান এবং নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী মি: জেনস স্টলেনবার্গ কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনান।

অনুষ্ঠানে আগত সম্মানিত মেহমানদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন :

* মিসেস গ্রীটি ফারেমো– নরওয়ের প্রতিরক্ষামন্ত্রী,
* মি: রজার কালিফ– সুইডেনের সোস্যাল ডেমোক্রিটিক পার্টির উর্ধ্বতন সদস্য,
* মি: এইজ টোভান– লরেন্সবার্গ-এর মেয়র,
* মিসেস র‍্যানহিল্ড বার্গহেইম– লরেন্স কাগ-এর মেয়র,
* মিসেস মিটি কর্সরাড– 'সোস্যাল ফ্রেন্ডস' পার্টির প্রেসিডেন্ট,
* মিসেস টুরিড ক্রিষ্টেন্সেস– কনজার্ভেটিভ পার্টির প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলর,
* মি: ষ্টীন কার্কেবি– কাউন্সিলর,
* মিসেস মারিয়া ওবেগার্ড– কাউন্সিলর,
* মি: টম নর্ডভোল– কাউন্সিলর,
* মি: ট্রিগভি বেকেশ্লেটন– কাউন্সিলর, (কে, আর, এফ),
* মি: পার হব্রাটন– কাউন্সিলর,
* মি: কেবাট জ্যান নীলমেন– ডাইরেক্টর অব ইনভেষ্টিগেশন, পুলিশ,
* মি: এরিক এন্ডারসন– ডাইরেক্টর, অসলো পুলিশ।

বৈকালিক অধিবেশনে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত মূল বক্তৃতাটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

তাশাহুদ, তা'উয এবং বিসমিল্লাহ্ পাঠের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন : "সম্মানিত মেহমানগণ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু–আপনাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। যারা আজ 'বাইতুন নছর' মসজিদের উদ্বোধনের আনন্দঘন এ অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে মিলিত হয়েছেন, তাদের সবাইকে সর্বাগ্রে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। এটা এমন এক ঘটনা, যেটা নরওয়ের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্যে পরম আনন্দের কারণ, যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ফজলে আমরা এদেশে 'বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণে সক্ষম হয়েছি'।

'মসজিদ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বুঝাতে আমি এক মিনিট সময় নেব। 'মসজিদ' হচ্ছে একটি আরবী শব্দ যাকে ইংরেজীতে 'Mosque' বলে। মসজিদ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'প্রার্থনার স্থান'। সুতরাং এ মসজিদের উদ্বোধন কোন বৈশ্বিক অথবা বস্তুগত বিষয় নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় একটি ঘটনা। এভাবে আমরা আজ এখানে নরওয়ের আহমদীয়া জামাতের 'প্রার্থনার স্থান'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি। আহমদী-মুসলমান না হয়েও আপনারা এ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আপনারা খোলা-মনের এবং আলোকিত অন্তর সম্পন্ন মানুষ। এটা এ-ও প্রমাণ করে যে, আপনাদের সবাই মানবিক-মূল্যবোধ ধারন করার আকাঙ্খা পোষণ করেন এবং পরস্পরের অনুভূতির প্রতি সহানুভূতিশীল। এটা লাভ করার লক্ষ্যে একান্ত প্রয়োজনীয় হিসেবে এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, সম্প্রদায় হিসেবে ধর্মীয় মত-পার্থক্য থাকা সত্বেও আমরা পারস্পরিক সুখ-দুঃখের সময়গুলোকে শেয়ার করি। এটা এমন মহৎ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা দ্বারা সমাজে ভালবাসা ও শান্তি বিস্তার লাভ করতে পারে। সুতরাং আজ এখানে উপস্থিত

হবার জন্যে আপনাদের সবাইকে আমি আমার অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই হৃদয়স্পর্শী কৃতজ্ঞতা কেবল নিত্যকর্মের নৈতিক-ভদ্রতা প্রদর্শনের খাতিরেই জ্ঞাপন করা হচ্ছে না, বরং প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয়-দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই আপনাদের প্রতি এ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হলো। এর কারণ হচ্ছে, আমাদের প্রভু পবিত্র নবী (সা.) সব মুসলমানকে এ নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে একটি গুণ, যা ধারণ করা বাস্তবিকপক্ষেই অপরিহার্য। তিনি (সা.) এত সুন্দরভাবে এ শিক্ষা দান করেছেন যে, **যে লোকটি তার প্রতিবেশীর প্রতি অকৃতজ্ঞ, সে আসলে খোদার প্রতিও অকৃতজ্ঞ।** আহমদীয়া মুসলিম জামাতের (বা সম্প্রদায়ের) প্রধান হিসেবে কোন ক্রমেই আমি সেই একক খোদা, যার ইবাদত আমি করে থাকি এবং আহমদীয়া জামাতের সদস্যদেরকে যার ইবাদত করতে নির্দেশ দেই, তাঁর অনুগ্রহ ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়া আমি সইতে পারি না।

এজন্যে আপনাদের সবার প্রতি একনিষ্ঠভাবে কৃতজ্ঞ হওয়া অপরিহার্য।

অধিকন্তু, পবিত্র কুরআন, যে গ্রন্থটি সব ইসলামী-শিক্ষার ভিত্তি, অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করেছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেছেন যে, আপনারা যদি কৃতজ্ঞতা-গুণটি প্রদর্শন করেন, তাহলে তিনি আপনাদেরকে তার চাইতেও অধিক দান ও পুরস্কার মঞ্জুর করবেন। অতএব, আমি আবারো বলবো যে, আপনাদের সবার প্রতিই আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কেবলই আনুষ্ঠানিকতা অথবা প্রথাভিত্তিক কোন বিষয় নয়, বরং তার বদলে যে কৃতজ্ঞতা আমি প্রকাশ করছি, সেটা আমার অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে আমি আশা করি যে, সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর ন্যায়-পরায়ণ ও অকপট বান্দাদের প্রতি আমার আন্তরিক-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। **নিশ্চয়ই, সর্বশক্তিমান খোদা তখনই খুশী হন, যখন তাঁর সৃষ্টি পরস্পরকে ভালবাসা প্রদর্শন করে।**

নরওয়ে বসবাসকারী আহমদীদের এক বড় সংখ্যা মূলত: এশিয়া থেকে এসেছে। এজন্যে আমি এটা দেখে খুবই খুশী হয়েছি যে, জাতিতত্ত্বের এই পার্থক্য সত্বেও আহমদী ও অ-আহমদী, আপনারা সবাই এক জাতির লোক হিসেবে মিলিত হয়েছেন। এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক যে, বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য থাকা সত্বেও আপনারা সবাই যৌথভাবে এজাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। আপনাদের সবাই, যারা আমাদের অতিথি, আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে আজ এখানে সমবেত হয়েছেন এবং আপনারা এখানে আপনাদের আহমদী-মুসলমানদের ভালবাসার আহ্বানে ভালবাসা দিয়েই সাড়া দিয়েছেন।

আমি এখন সে বিষয়ের দিকে ফিরে যেতে চাই যে "মসজিদ"-আসলে কী। ইতোপূর্বে আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি, "মসজিদ" শব্দটির অর্থ হচ্ছে "ইবাদতের স্থান"। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আমি আরো কিছু বলতে চাই। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, অমুসলিমগণ যখন "মসজিদ" শব্দটি শুনতে পান, তখন প্রায়শ: তাদের মনে খুবই অদ্ভুত ও ভীতিকর ধারনার উদ্রেক হয় এবং তারা গভীরভাবে ভীত হয়ে পড়েন। যখন তারা দেখেন যে, একটি মসজিদ বানানো হচ্ছে, তখন তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যা হয়, সেটা হচ্ছে তারা এটা ভেবে এমন ভয় ও আতঙ্ক বোধ করে যে, খোদা না করুন, এই মসজিদটি সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার পথ সুগম করতে চলছে। এই প্রসঙ্গে আমি সংক্ষেপে এই বিষয়টি পরিষ্কার করা জরুরী মনে করি যে, একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্যে মসজিদ বলতে আসলে কী বুঝায়। এ বিষয়টি অনুধাবনে সাহায্য করতে আমি আপনাদেরকে শব্দটির অভিধান-সংক্রান্ত আক্ষরিক সংজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করবো।

অভিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে 'মসজিদ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নামাজের ঘর'। ইতোপূর্বে যেভাবে আমি ব্যাখ্যা করেছি, উপাসনালয়কে আরবী ভাষায় 'মসজিদ' বলে, আর 'মসজিদ' শব্দটি আরবী শব্দ 'সিজদা' থেকে উদ্ভুত, যার শাব্দিক অর্থ 'সে (পুরুষ অথবা স্ত্রী লোক) নিজে সিজদাবনত হলো'। সুতরাং আমরা যদি 'উপাসনালয়' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাই যে, এটা আমাদেরকে কেবলই উপাসনা ও সিজদার দিকে চালিত করে। স্বাভাবিক ভাবেই যে প্রশ্নটি এখানে উঠে আসে, তা হচ্ছে, এখন কি ধরনের প্রণতি সম্পন্ন করা হবে? এর জবাব হচ্ছে, একজন মুসলমান যখন উপাসনায় আনত হয়, তখন তার সমগ্র শরীর পূর্ণ-নম্রতায় আচ্ছন্ন হওয়া উচিত এবং নিজেকে মূল্যহীন বিবেচনা করা উচিত। নম্রতার এই মূল-নীতি সহ পূর্ণ-সমর্পণ ও আনুগত্য নিয়েই তার উচিত খোদার সামনে নত হওয়া। এই বশ্যতাপূর্ণ অবস্থাতেই তার উচিত খোদার সামনে প্রণত হওয়া, যাতে খোদা তাকে শক্তি দেন, যেন সে খোদার প্রত্যেকটি নির্দেশ পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। এভাবে, **সেটাই হচ্ছে খাঁটি-মসজিদ, সর্বশক্তিমান খোদার সামনে নত হবার সার্বিক-নম্রতাপূর্ণ স্থান যেটা।**

দুঃখজনক হলো, ইসলামের এমন অনেক বিরুদ্ধবাদী রয়েছেন, যারা এর পবিত্র নামে নিন্দা করতে সক্রিয়ভাবে লেগে আছেন এবং এ মিথ্যা প্রচারকার্য চালাতে নি:শেষ হচ্ছেন যে, খোদা না করুন, পবিত্র কুরআন রক্তপাত আর সন্ত্রাসবাদকে বৃদ্ধি করে। এই পর্যায়ে, **অতিব দুঃখের সাথে আমি অবশ্যই এটা বলবো যে, মুসলমানদের কতিপয় দল বারবার তাদের ভ্রান্ত ও ঘৃণ্য সন্ত্রাসী-**

কর্মকান্ড দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদেরকে ইসলাম ধর্মের দুর্নাম রটানোর সুযোগ দিচ্ছে। আমার বিভিন্ন বক্তৃতায় আমি বিশ্বজুড়ে সর্বত্রই এ বিষয়টির উল্লেখ করেছি।

এ বিষয়টি শর্তহীন ভাবে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, এসব তথাকথিত মুসলমানরা ইসলামের প্রতি ভালবাসার কারণে নয়, বরং শুধু নিজেদের স্বার্থপর বাসনা ও কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে প্ররোচিত হয়ে এসব কাজ করে যাচ্ছে। প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে যারা জানতে চায়, তাদেরকে আমি এ অনুরোধ করবো যে, তারা যেন এসব বিষয় স্মরণ রেখে প্রচার-মাধ্যমগুলোতে সন্ত্রাসীদের ঘৃণাপূর্ণ কাজ ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচারণাগুলো ফোকাস না করেন, কারণ, ইসলামকে সুন্দর ও ন্যায়পরায়ণ পদ্ধতিতে বিচার করার জন্যে ওগুলো কোন সঠিক উৎস নয়। তার পরিবর্তে ঐসব লোক, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে যাদের অধ্যয়ন করার পিপাসা রয়েছে, তাদেরকেই ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করবো। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনই হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে জানার সবচে' খাঁটি উৎস, যা পবিত্র নবী (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আমরা যখন 'জিহাদ' ও "ধর্মীয়-যুদ্ধের বিষয়টি লক্ষ্য করি, তখন দেখতে পাই যে, কেবল কতিপয় বিরল ঘটনায় মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দান করা হয়েছিল, আর সে অনুমতিও ছিল কঠিন শর্ত সাপেক্ষে এবং কেবলই কিছু বিরল ও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে। উপরন্তু, আমরা যদি এটাকে সুসামঞ্জস্য পদ্ধতিতে নিরূপন করতে চাই, তাহলে আমরা দেখবো যে, বাইবেল সহ অন্যান্য পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থাদিতে যুদ্ধ করার অনুমতি দান করা হয়েছে। যাহোক, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থাদি এ বিষয়ে কি বলে, তা নিয়ে এখন আমি আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই না। তার বদলে আমি কেবল এ কথাই বলতে চাই যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলামের আসল ও মৌলিক শিক্ষা বর্ণনা করে। আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ধর্মীয় যুদ্ধ ও জিহাদের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বলে গেছেন। তিনি শিখিয়েছেন যে, বর্তমানে যে পরিবেশ বিদ্যমান, সেটা ধর্মের নামে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় না। বাস্তবে, তিনি শিখিয়েছেন যে, ধর্মীয়-যুদ্ধের যুগের অবসান হয়েছে। ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাসমূহ বুঝতে সাহায্য করার সহজ উপায় হিসেবে ইসলামের প্রাথমিক যুগের যেসব পরিস্থিতিতে পবিত্র কুরআন ধর্মের কারণে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিল, সেগুলো সংক্ষেপে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো।

যাহোক, সেদিকে অগ্রসর হবার আগে অল্প কয়েক মাস পূর্বে ২২ জুলাই, ২০১১-তে নরওয়েতে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই। উপরন্তু, উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি আমার অন্তরের অন্ত:স্থল থেবে সেসব নিরীহ লোকদের জন্যে শ্রদ্ধা-মিশ্রিত গভীর শোক প্রকাশ করছি, যারা ঐ দুঃখদায়ক ঘটনায় তাদের জীবন হারিয়েছেন। সমগ্র নরওয়ে-জাতির জন্যে এটা গভীর দুঃখ ও বেদনার দিন ছিল এবং থেকে যাবে। আমাদের জামাতের পরিপ্রেক্ষিতে নরওয়ের প্রত্যেক আহমদী, তারা যে দেশে থেকেই এসে থাকুক, এ ভয়াবহ ঘটনায় গভীর দুঃখ ও যাতনা অনুভব করে। যে কোন খাঁটি মুসলমানের পক্ষে নিজ দেশ এবং মানবজাতির জন্যে ভালবাসা পোষণ করা একটি জরুরী ঈমানী-দায়িত্ব। এ কারণেই পবিত্র নবী (সা.) পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন যে, নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা হচ্ছে ঈমানের এক মৌলিক অংশ। অতএব, একজন মুসলমান, সে যে দেশেই বাস করুক এবং যে দেশেরই নাগরিক হোক, এবং যে দেশ থেকেই সে সুবিধা ভোগ করুক, এটা তার জন্যে জরুরী যে, সে সেদেশকে আন্তরিকভাবে ভালবাসবে। তার পছন্দের এই দেশের প্রতি যদি সে ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়, তবে তার এবাদত হবে প্রয়োজনীয় বিনয় ও আনুগত্য বিবর্জিত। আর এধরনের লোকের জন্যে

মসজিদে আগমন করা এক মূল্যহীন-কাজে পরিণত হবে।

পবিত্র কুরআনের এক অতি-পরিচিতি আদেশ আমাদেরকে এ সতর্কতা শিখায় যে, কোন লোক যখন অন্য কাউকে বিনা কারণে হত্যা করে, সেটা হচ্ছে এমন এক কাজ, যেন সে সমগ্র মানজাতিকেই হত্যা করলো। অপরপক্ষে, পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে যে, কেউ যদি কারো জীবন বাঁচায়, তবে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই বাঁচালো। মানবীয় মূল্যবোধকে রক্ষা করার উপায় হিসেবেই এ আদেশটি দান করা হয়েছে। অতএব, যেভাবে আমরা অল্প কিছুদিন আগে সংঘটিত লোমহর্ষক দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছি, এটা পরিস্কার করা প্রয়োজন যে, কেবল এখানে বসবাসকারী আহমদীরাই আপনাদের এ ক্ষতি ও দুঃখ অনুভব করে না বরং সারা বিশ্বে বসবাসকারী আহমদীরাই আপনাদের দুঃখ ভাগ করে নেয়। নির্দিষ্ট এই সন্ত্রাসী হামলাটি একজন মুসলমান কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে, যাহোক, যদি কখনো কোন সন্ত্রাসী নিজেকে কোন ধর্মের সাথে যুক্ত করে, তখন এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন ধর্মই এ ধরনের হিংস্রতার অনুমতি দেয় না, আর বাস্তবতা হচ্ছে, এ ধরনের সন্ত্রাসীদের কোনই ধর্ম নেই। ইতোমধ্যে আমি নরওয়ের সরকারকে আমার শোকবার্তা প্রেরণ করেছি, যেভাবে পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মহোদয় সে-বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যাহোক, আমি আবারো আমার নিজের এবং সারা বিশ্বের প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ে-নিংড়ানো শোকবার্তা ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার ও সমগ্র জাতির নিকট প্রকাশের সুযোগ নিতে চাই।

আপনাদের সবাইকে আমি আবারো একটি কথা নিশ্চিত করে বলতে চাই যে, সন্ত্রাসবাদ এবং চরমত্ববাদ-এর মোকাবিলা করে সেটাকে উৎখাত করতে সমগ্র বিশ্বের আহমদীরা যেভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, ঠিক সেভাবে এখানেও, নরওয়েতে অবস্থানকারী সব আহমদীই আপনাদের সরকার এবং আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের লোকদের পাশে দাঁড়াবে। সব ধরনের সন্ত্রাস, সেটা ধর্মের নামেই হোক আর কোন রাজনৈতিক-সন্ত্রাস-ই হোক, অথবা মেকিভাবে সৃষ্টই হোক, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সার্বিক ঘৃণা ও নিন্দা প্রকাশ করছি।

প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরকে কোন্ বাস্তব-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তার ব্যাখ্যায় এবার আমি ফিরে যেতে চাই। পবিত্র কুরআন হচ্ছে একটি খোলা-কিতাব এবং সেখানে পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গিও সবার দেখার জন্যে উন্মুক্ত রয়েছে। ইসলামের শিক্ষাসমূহের অথবা ইসলামের ইতিহাসের

কোন অংশই বাতিল হয়ে যায়নি। যে-কোন ইতিহাসবিদ অথবা গবেষক, যিনি নিরপেক্ষভাবে এবং বাস্তবতার সাথে অধ্যয়ন করেন, তিনি শীঘ্রই এটা অনুধাবন করবেন যে, সাধারণভাবে সংবাদ মাধ্যমে যেভাবে ইসলামকে চরম-পন্থার ধর্ম হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সেটা সর্বোতভাবেই অনৈতিক এবং ভ্রমাত্মক। আসলে অনেক অ-মুসলিম পন্ডিত এবং শিক্ষাবিদ প্রকৃতপক্ষেই ইসলামের পক্ষে লিখেছেন এবং অনেক আপত্তিই খন্ডন করেছেন। এমন পন্ডিতগণ খ্রীষ্টান, হিন্দু এবং অন্য ধর্মের লোকদেরকেও সম্পৃক্ত করেছেন। স্যার উইলিয়াম ম্যুর ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন সুপরিচিত প্রাচ্য-ভাষাবিদ। সহজাতভাবে তিনিও ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ খুঁজতেন এবং তা গ্রহণ করতে চাইতেন। যাহোক, অধ্যয়ন ও গবেষণার উপর নির্ভর করে তা যথাযথভাবে বিবেচনা করার পর তিনি খুব ইতিবাচক ভাবেই ইসলামের শিক্ষাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং নির্দিষ্টভাবে দাস ও যুদ্ধবন্দীদের সাথে ইসলামে দয়ার্দ্র-ব্যবহারের কারণে তিনি ইসলামের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন।

আমরা যদি সাম্প্রতিক কালের দিকে একবারও তাকাই, তাহলে দেখতে পাই যে, কারেন আর্মস্ট্রং ইসলাম এবং বিশেষ করে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) এর অনুপম গুণাবলীর বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। যুক্তরাজ্যের আরেকজন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর রিচার্ড বনি, যিনি ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আহরণের জন্যে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি 'চার্চ অব ইংল্যান্ড' থেকে `Reverend' উপাধি লাভ করেছেন এবং তিনি বিভিন্ন সমাজের একজন অগ্রগামী সদস্য। ইসলাম এবং বিশেষ করে 'জিহাদ'-এর বিষয়ে প্রফেসর বনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। অনেক গবেষণা এবং বিশ্লেষণের পর তিনি এ মন্তব্য করেন যে, জিহাদের যে ব্যাখ্যা চরমপন্থীদের দ্বারা প্রদান করা হয়ে থাকে, সেটা ইসলামের এক সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। আসলে তার এ মন্তব্যে তিনি আমাদের আহমদীয়া জামাতের কথাই এক ইতিবাচক-সাক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কোন উন্নতমনা এবং ন্যায়বাদী লোকই ইসলামকে এমন কোন ধর্ম হিসেবে মনে করতে পারে না, যা কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদ অথবা চরমত্ববাদ প্রচার করে।

যদিও এ প্রশ্নটি থেকে যায় যে, কোন্ পরিস্থিতিতে ইসলামে ধর্মীয়-যুদ্ধগুলোর অনুমতি দেয়া হয়েছিল? এ প্রশ্নের জবাব অনুধাবন করতে আমাদেরকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সেই ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে, যেখানে মক্কার কাফেররা মুসলমানদেরকে সবরকমের নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও উৎপীড়নের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিল। তথাপি, এ ধরণের বেপরোয়া পরিস্থিতিতেও মুসলমানরা পূর্ণ-ধৈর্য প্রদর্শন করে চলে এবং কেবল পবিত্র নবী (সা.) এর নির্দেশ মোতাবেকই তারা এমনটি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানরা নবী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করতো যে, তারা কাফেরদের দুর্ব্যবহারের জবাব দেবে কি-না অথবা নিরাপত্তা-বিধান করবে কি-না। পবিত্র নবী (সা.)কে সম্বোধন করার সময় তারা তাঁকে (সা.) স্মরণ করাতো যে, তারাও তো মক্কারই নাগরিক এবং অত্যাচারীদের গোত্রেরই লোক। তারা আরো বলতো যে, মক্কাবাসীদের তাদের একই পটভূমি থাকায় তারাও জানে যে, কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়। যাহোক, যতবারই তারা এমন প্রশ্ন করতেন, পবিত্র নবী (সা.) এর জবাব ছিল একই, আর তা ছিল, 'তোমরা অবশ্যই ধৈর্য-ধারণ করবে, কারণ পাল্টা-যুদ্ধ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে অনুমতি দেন নি'। মানবজাতির ইতিহাসে এমন ধৈর্যশীলতার উদাহরণ কেউ কখনো প্রত্যক্ষ করেনি, যেটা পবিত্র নবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবা (রা.)গণ প্রদর্শন করেছেন।

আমার বিবেচনায়, পবিত্র নবী (সা.) এর সিদ্ধান্তের মধ্যে এমন ধরণের সংযম প্রদর্শন ভবিষ্যতের জন্যেও এক সোনালী-নীতি ও পাঠ স্থাপন করছে। এ নীতিটি হলো, আপনাদেরকে কে পরিচালনা করছে সেটা কোন বিষয় নয়, আপনারা কোন অবস্থাতেই কোন-প্রকারের বিদ্রোহ করবেন না, যেটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অধিকতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। আজকের বিশ্বের অনেক দেশে, যেখানে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটছে, সেখানে এই নীতি বিশেষভাবে অনুসরণ-যোগ্য।

সে সময় মুসলমানরা তিক্ত নিষ্ঠুরতার মোকাবিলা করে চলছিল এবং এ কারণে অনেকেই জীবন উৎসর্গ করেছে এবং তারপরও তারা তাদের ধৈর্যের চমক প্রদর্শন করে চলছিল। কেবল নির্ধারিত কয়েকজনের মধ্যেই এই সংযম সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মুসলমান সবাই নারী, পুরুষ, শিশু এবং বৃদ্ধরাও তা প্রদর্শন করেছে। বহু-বছর ধরে পরিচালিত প্রবল অত্যাচারের পর পবিত্র নবী (সা.) এবং তাঁর অনেক সাহাবী (রা.) মদীনা শহরে হিজরত করলেন। এভাবে মুসলমানদের এক বড় জামাত শহরটিতে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের ও মদীনার ইহুদীদের মধ্যে একটি সন্ধি হলো। সন্ধির শর্তাদি মোতাবেক পবিত্র নবী (সা.)-কে তাদের সরকার প্রধান বানানো হলো। মদীনার বিরাজমান অবস্থা সমূহের কারণে মুসলমানরা অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম হলো এবং এভাবে ইসলাম দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। মুসলমানদের সাফল্য ও শান্তিপূর্ণ-বসবাসের খবর যখন মক্কায় পৌঁছে গেল, তখন মক্কার কাফেররা মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলো। এটাই ছিল সেই অবস্থা, যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কাফেরদেরকে প্রতিরোধ করার জন্যে মুসলমানদেরকে সর্বপ্রথম যুদ্ধ করার চূড়ান্ত অনুমতি দান করলেন। এই অনুমতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

"যুদ্ধ করার অনুমতি তাদেরকেই দেয়া হলো, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা হয়েছে, কারণ তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয়েছে-এবং তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা বাস্তবিক পক্ষেই আল্লাহ্ তাআলার রয়েছে। ঐসব লোক, যারা অন্যায়ভাবে, শুধু এ কারণে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছে যে, তারা বলেছে, 'আল্লাহ্-ই হচ্ছেন আমাদের প্রভু'–এবং যদি কিছু লোককে আল্লাহ্ অন্যদের দ্বারা তাড়িয়ে না দিতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা মঠ ও গীর্জাসমূহ এবং ইহুদীদের ধর্ম-মন্দির ও মসজিদগুলো ধ্বংস করে ফেলতো, যেখানে প্রায়শঃ আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে আল্লাহ্কে সাহায্য করে। বাস্তবিক পক্ষেই আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী" (২২ : ৪০-৪১)।

আমরা যদি এসব আয়াতের অর্থ বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করি, যা এখন আমি বর্ণনা করলাম, তাহলে তখনকার মুসলমানরা যে-অবস্থার শিকার হয়েছিল, তা পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হবে। মক্কার কাফেররা মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন করতে

গিয়ে সব সীমা ও মাত্রা লঙ্ঘন করে ফেলেছিল। এজন্যে আল্লাহ্ এ নির্দেশ দান করলেন যে, তাদের নিষ্ঠুরতা বন্ধ করার জন্যে এটা ছিল মোক্ষম সময়। এটা করতে ব্যর্থ হলে ইসলাম কেবল বিপদাপন্নই হতো না, বরং তার ফলে কোন গীর্জা, মঠ, মসজিদ, অন্যকোন এবাদতের স্থানই নিরাপদ থাকতো না। অন্য কথায়, যারা সর্বশক্তিমানের উপাসনা করতে আকাঙ্খা পোষণ করে, তারাও সমূলে উৎপাটিত হতো। যদি আমরা আসলেই এই অনুপম শিক্ষার উপর চিন্তা করি, তাহলে এটা অনুধাবন করতে পারবো যে, যুদ্ধ করার এই অনুমতি যখন সর্বশেষে মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন এটা কেবল ইসলমাকে রক্ষা করার জন্যেই নয়, বরং সব ধর্ম ও উপাসনার স্থানগুলোকে রক্ষা করার জন্যেও দেয়া হয়েছিল। এ কারণে, যখন আমরা একটি মসজিদের কথা চিন্তা করি, তখন আমাদের মনে ধর্ম-নির্বিশেষে সব উপসনালয়ের সম্মান ও পবিত্রতার কথাও আমাদের মনে প্রবেশ করে।

ইসলামের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে এমন কিছু আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে যে, মদীনার মুসলমানরা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, আর এ-কারণে তারা নিজেরাই যুদ্ধ করতে মনস্থ করে। এ দাবীটি সম্পূর্ণ ভুল এবং সময়ের প্রেক্ষাপটে সব সত্যেরই বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে মক্কার কাফেররাই মদীনা আক্রমণ করে আর সে কারণে মুসলমানরা কোনভাবেই আগ্রাসী ছিল না। পার্থিব শক্তির কথা বিবেচনা করলে মক্কার সেনাদলে অন্তর্ভূক্ত ছিল অনেক বেশী সংখ্যক সৈন্য, অশ্বারোহী ও অস্ত্রধারী সেনা (আমার পাশে উপবিষ্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহোদয় ভালই জানেন যে, এসব বস্তু আসলে কী)। তাদের অস্ত্রের বিশাল মজুদের তুলনায় মুসলমানদের ছিল মাত্র তিনটি তরবারি এবং অল্প ক'টি ঘোড়া। ইতিহাস এ-সত্য ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে যে, পবিত্র নবী (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের উভয়-যুগে যেখানেই কোন প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের পরিস্থিতির উদ্ভব হতো, তারা যুদ্ধের জন্যে নির্ধারিত আইনসমূহ কঠোরভাবে অবলম্বন করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, তারা কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন, যাতে কোন উপসনালয়, কোন যাজক অথবা ধর্মীয়- নেতা, কোন নারী, শিশু অথবা কোন বৃদ্ধ লোকের কোন ক্ষতি করা না হয়। আসলে তাদেরকে কঠোরভাবে এ নির্দেশ দেয়া হতো যে, কোন অসৈনিক লোক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এবং উপরন্তু কোন লোককেই যেন কখনো জবরদস্তির মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষিত করা না হয়। উপরন্তু, এতে তারা কেবল দালান-কোঠা এবং সাধারণ জনগণকেই রক্ষা করেনি, পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা করেছে। এভাবে তারা এ নির্দেশও দিতেন, যাতে যুদ্ধের সময়ে এবং তার পরেও কোন বৃক্ষ কর্তন অথবা ধ্বংস করা না হয়, তা সেটা ফলদায়ক অথবা সাধারণ বৃক্ষই হোক।

'তরবারি দ্বারা ইসলাম প্রসার লাভ করেছে'–এই আপত্তির বিষয়ে একজন খৃষ্টান ইতিহাসবিদ লিখেছেন যে, 'মুসলমানদেরকে যদি জোরপূর্বক এবং নিষ্ঠুরতা অথবা অত্যাচারের মাধ্যমে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত করা হয়ে থাকতো, তাহলে প্রথম সুযোগেই তারা ধর্মটা ত্যাগ করতো এবং এর প্রতি কোন প্রকার আনুগত্য প্রদর্শন করতো না। তথাপি এর বিপরীতে প্রাথমিক যুগের ঐসব মুসলমানরা ঈমান রক্ষায় সর্বদাই তাদের সব কিছুই কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকতো। অতএব তাদের এ ধর্মান্তর জোর পূর্বক হয়নি, বরং ঐসব লোকের অন্তরে খাঁটি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল'।

সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে আমি এ বিষয়টি এখন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারছি না। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃত-আয়াত দু'টোর আলোকে আমার বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, ইসলাম প্রত্যেক ধর্মের উপাসনার স্থান সমূহের হেফাজত করে থাকে। এভাবে একজন প্রকৃত মুসলমান, যিনি খোদার ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে

প্রবেশ করেন, তিনি কখনো অন্য কোন লোকের ক্ষতি করার চিন্তা করতে অথবা কোন প্রকার নিষ্ঠুরতায় লিপ্ত হতে পারেন না। ইতোপূর্বে আমি পবিত্র কুরআনের এ রায়টি উল্লেখ করেছি যে, কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিত কোন লোককে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করার সামিল। অতএব, এটা পরিষ্কার যে, ইসলাম কোনভাবেই বা কোন ক্রমেই নরহত্যার অনুমতি দেয় না। একইভাবে কোন একজন মানুষের প্রতিও নিষ্ঠুর অথবা অন্যায় আচরণ করা সমগ্র মানবজাতির প্রতিই নিষ্ঠুর ও অন্যায়-আচরণ করার সামিল।

ইসলাম কোন ধরনের নিষ্ঠুরতা অথবা প্রতিশোধ-গ্রহণকেই অনুমতি দেয় না, এমনকি সেসব লোকদের বিরুদ্ধেও নয়, যারা আপনাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে। আসলে, পবিত্র কুরআন আমাদেরকে পক্ষপাতহীন এবং ন্যায়ানুগ হবার শিক্ষা দেয়, এমনকি তা আমাদের শত্রুদের প্রতিও। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে :

"হে যারা ঈমান এনেছো, ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য বহনে খোদার খাতিরে অবিচল থাক এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার করার পরিবর্তে অন্য কিছু করতে প্রলুব্ধ না করে। সর্বদা ন্যায় পরায়ণ হও, সেটাই হচ্ছে খোদাভীরুতার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ অবশ্যই সেটা অবগত আছেন" (৫ : ৯)।

এ অনুপম শিক্ষা স্মরণ রেখে কোন লোক কীভাবে এ আপত্তি করতে পারে যে, ইসলামের শিক্ষাগুলো মানুষের অধিকারকে জবরদখল এবং সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করে? এর পরও এখানে ইউরোপে এমন অনেক লোক রয়েছেন, যারা-এ সংশয় করে থাকেন যে, মুসলমানরা যদি বেশী বেশী কেন্দ্র ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সেটা পশ্চিম-জগতে বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ পরিচালনা করবে, যেভাবে মুসলিম বিশ্বে পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে ভালবাসা ও মমতার, যেটা আপনারা সবাই আমার বক্তব্য থেকে অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের প্রতিও ন্যায়-পরায়ণ হতে, খোদাকে ভয় করতে এবং কেবল এক খোদারই উপাসনা করতে বলা হয়েছে।

যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে খোদার উপানা করতে, এবং এটা প্রাকৃতিক এক অগ্রগতি যে, যে-ব্যক্তি খোদার উপাসনা করে একই সাথে সে খোদার সৃষ্ট-জীবকেও ভালবাসে। সর্বশক্তিমান খোদা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)কে সমগ্র মানবজাতির জন্যে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ কারণে তাঁর অন্তরে সমগ্র মানব জাতির জন্যে অতুলনীয় ভালবাসা ছিল। তাঁর (সা.) এ তীব্র আশা ও আকাঙ্খা

ছিল যে, প্রত্যেকেই নিজ-সৃষ্টিকর্তাকে শনাক্ত করুক, তাঁর উপাসনা করুক এবং তাঁর সাথে ভালবাসাপূর্ণ-সম্পর্ক স্থাপন করুক। এ উদ্দেশ্য সাধনে তিনি (সা.) সারারাত সিজদাবনত থাকতেন এবং মানুষকে তাদের সৃষ্টি-কর্তাকে শনাক্ত করানোর আকঙ্খায় মর্মপীড়িত থাকতেন। তাঁর এই মর্মপীড়ার প্রেক্ষিতে সর্বশক্তিমান খোদা বলেন :

"তুমি কি এজন্যে দু:খ করে মৃত্যুমুখে পতিত হবে যে, লোকেরা ঈমান আনে না" (২৬ :)।

এ আয়াত থেকে আমরা কেবল এটাই বুঝি যে, পবিত্র নবী (সা.) কতই না কষ্ট পেতেন, যখন তিনি দেখতেন যে, তাঁর চারপাশের কাফেররা খোদার সাথে অংশীদার স্থাপনে ও মূর্তিপূজায় রত আছে। তারা যে সর্বশক্তিমান খোদার প্রতি ঝুঁকতো না, এ বিষয়টি তাঁকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত করতো। এ আয়াত থেকে এটাও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায যে, পবিত্র নবী (সা.) এর পবিত্র আত্মা এ আশা পোষণ করতো যে, প্রত্যেক মানুষই খোদার পরিচয় জানুক এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনুক। যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, বরং ঐকান্তিক প্রার্থনার মাধ্যমে তিনি মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। আজকের দিনে এটাই হচ্ছে হুবহু সেই অনুরোধ, যা আহমদীয়া মুসলিম জামাত অনুসরণ করে এ যুগে এক অনন্য-জামাত হিসেবে রূপলাভ করেছে।

আমি এ প্রত্যাশা করি যে, যেসব বিষয় আমি সংক্ষেপে উত্থাপন করেছি, তা এ বিষয়টি বর্ণনা করে যে, একজন প্রকৃত মুসলমান, যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং তাঁরই ইবাদতের উদ্দেশ্যেই একটি মসজিদ বানায়, সে কখনোই অন্য কোন ধর্ম অথবা অন্য কোন লোকের বিরুদ্ধে সামান্যতম ঘৃণাও পোষণ করতে পারে না। মানবজাতির প্রতি ভালবাসা এবং সমবেদনার কারণে আমরা, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা অবশ্যই আমাদের বার্তাটি প্রচার করতে বাধ্য, যাতে মানুষ সর্বশক্তিমান খোদার দিকে আসতে পারে। আমরা পবিত্র নবী (সা.) এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণের অনুসরণ করি। এভাবে, তিনি যেমনটি দোয়া করে গেছেন, আমরাও সমগ্র বিশ্বের জন্যে দোয়া করি, যাতে মানবজাতি এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে এবং তাঁর হেদায়াত মানতে ও সেই অনুযায়ী তাঁর ইবাদত করতে পারে।

আরো একটি বিষয়, যা আমি পরিষ্কার করতে চাই, তা হচ্ছে, দুঃখজনকভাবে ইতিহাসজুড়েই কতিপয় এমন মসজিদ রয়েছে, যেগুলো তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করেনি। তার বদলে ঐসব ইমারত বিশৃঙ্খলা ও নিষ্ঠুরতা বিস্তারের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরনের মসজিদগুলো সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, এগুলো সেসব লোকদের দ্বারা তৈরী, যাদের অন্তরে খোদাভীতি নেই। প্রকৃত মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআন এসব মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এসব মসজিদ আজও বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশের আলোকে এবং সমাজের আইন মোতাবেক সরকার এগুলো বন্ধ করে দিতে পারে। যাহোক, কেবল সমন্বিত এবং ন্যায়ানুগ অনুসন্ধান করার পরেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে এটা প্রমাণ হয় যে, কথিত ঐ মসজিদটি এবাদতের বদলে দেশ ও উহার জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে থাকে। যাহোক, এমন কোন চরমপন্থার দিকে যাওয়া আমাদের উচিত নয়, যা দ্বারা প্রত্যেক মসজিদের বিষয়ে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি হয় যে, প্রত্যেক মুসলমান এবং প্রত্যেকটি মসজিদ-ই কেবলই গুজব ও জনশ্রুতির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। সব মুসলমানকে একত্রে এধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিহ্নিত করা সবধরণের ন্যায় বিচারেরর পরিপন্থি।

নরওয়ের জনগণের কাছে এটা আমার আন্তরিক অনুরোধ যে, তারা যেন আমাদের আহমদীয়া মসজিদের বিষয়ে কোন ভীতি-জনক অথবা নেতিবাচক ধারণা পোষণ না করেন। কেবল **এক খোদার ইবাদত করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। এখান থেকে আপনারা কেবল শান্তি, ভালবাসা-ও মিলনের বাণীই শুনতে পাবেন। এ মসজিদ থেকে সহিষ্ণুতা, সমবেদনা ও ন্যায়বিচারের পতাকাই উত্তোলিত হবে। নিশ্চিত থাকুন, প্রত্যেক আহমদী মুসলমান, যারা এ মসজিদে প্রবেশ করে, মানবজাতির জন্যে তাদের থাকবে খাঁটি ও গভীর ভালবাসা এবং এ জাতির আইন সমূহ তারা পূর্ণভাবে মেনে চলবে।**

এ যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, যাকে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলে বিশ্বাস করি, আমাদের কাছে ইসলামের আসল ও সুন্দর শিক্ষাসমূহ তুলে ধরেছেন। ইসলামের এই সত্য পুন:সংস্থাপনের উপরই সব আহমদী-মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। এসব বিষয় স্মরণ রেখে আমাদের জন্যে শুধু দু'টি মৌলিক কাজ রেখে দেয়া হয়েছে। সর্বপ্রথমে আমাদেরকে অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অধিকার হিসেবে বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র উপাসনার অধিকার পূরণ করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত: আমাদেরকে তাঁর সৃষ্টির হকও আদায় করতে হবে। এটা হচ্ছে এক অনুপম ও চিরস্থায়ী শিক্ষা, এবং সমগ্র বিশ্ব যদি এটা বুঝতে এবং গ্রহণ করতে পারে, তাহলে সবগুলো সমাজই ভালবাসা ও প্রীতি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। পাশবিকতা ও যুদ্ধের পরিবর্তে তখন আমরা শান্তি ও ঐক্য প্রত্যক্ষ করবো। অন্যের সম্পদকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখা আমাদের উচিত নয় এবং একইভাবে অন্যের অধিকারগুলোও জবরদখল করা আমাদের উচিত নয়। তার পরিবর্তে আমাদের উচিত মানবিক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক ভালবাসা প্রতিষ্ঠা এবং তা সংরক্ষণ করা।

আজকের দিনে বিশ্বের কতিপয় শক্তি তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের নামে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। এ ধরনের ভ্রান্ত-নীতিগুলো হচ্ছে ন্যায় বিচারহীনতা এবং খোদাকে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হবারই পরিণতি। আমার আকুল আবেদন হচ্ছে, **বিশ্ব সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবন করুক যে, সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার উপরই বিশ্বের টিকে থাকা নির্ভর করছে।**

আল্লাহ্ না করুন, বিশ্ব যদি এটা করতে ব্যর্থ হয়, তহালে স্মরণ রাখবেন, ধ্বংসের বর্তমান পথেই বিশ্ব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকবে। এ ধ্বংস কোন মসজিদ দ্বারা সংঘটিত হবে না, বরং কেবল ন্যায়বিচারের অভাবের কারণেই হবে, আর যেটার মূলে রয়েছে খোদার সৃষ্টজীবের তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে ব্যর্থ হওয়া।

পরিশেষে আমি আবারো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, যাদের সবাই আমার দৃষ্টিতে সম্মানীয় ও শ্রদ্ধাষ্পদ অতিথি, যারা আজ আমাদের এ অনুষ্ঠানে তাদের মূল্যবান সময় দান করেছেন"।

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

13th February 2012
PRESS RELEASE

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

New Ahmadiyya Mosque opened by World Leader in London

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said the Tahir Mosque will be a place of peace

The Ahmadiyya Muslim Jamaat is pleased to announce that on 11 February 2012, its world leader, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad inaugurated the new Tahir Mosque in Catford, London.

The opening of the Mosque was also attended by a number of dignitaries and guests, including Heidi Alexander, MP for Lewisham East and Sir Steve Bullock, the Mayor of Lewisham.

Upon arriving at the premises, His Holiness officially inaugurated the mosque by unveiling a commemorative plaque and then offering a silent prayer in thanks to God Almighty. Thereafter a tree was planted by His Holiness to further mark the occasion.

After offering prayers in the mosque, His Holiness held an audience with local Ahmadi Muslims, in which he urged them to always remember the true purposes of a mosque. He reminded them that a mosque should be a place of inner and outer purity. And he said that Ahmadi Muslims should always maintain an atmosphere of mutual love and affection and thus illustrate Islam's peaceful teachings to the world.

After a private meeting between His Holiness and local dignitaries, the official reception marking the opening of the mosque began at 6.40pm. In his welcome speech, a local Ahmadi leader, Mr

Naseem Butt spoke about how the mosque had been funded entirely by the Ahmadiyya Muslim Jamaat itself. He said a number of women had even donated their jewellery whilst young children had offered their pocket money to help fund the mosque.

Heidi Alexander MP, congratulated the Ahmadiyya Muslim Jamaat on the opening of the mosque. She wished the Jamaat well and said that she looked forward to working with the community in future.

Sir Steve Bullock, Mayor of Lewisham, said that he was familiar with the building already, as before being converted to a mosque, it had served as offices for the local Council. He congratulated the Jamaat and said that having a home for any community was very important and was a means for its growth.

Both Heidi Alexander MP and Sir Steve Bullock also thanked the Ahmadiyya Muslim Jamaat for making donations to their local nominated charities as a further means to mark the opening of the mosque.

The function was concluded with an address by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, in which he said that all Ahmadi Mosques were built to worship Allah and to serve humanity.

Speaking about the importance of the latter, he said:

"It is essential that a Muslim should never usurp the rights of others and instead he should cast aside all differences of religion, nationality or ethnicity and seek to become the means of support and love for all others. If someone comes to a Muslim for help, then it is the duty of the Muslim to try and fulfil that need."

His Holiness also spoke about the fear some people held of mosques and of Islam itself. He said such fear was justified because of the acts of extremists who were destroying the peace and security of society at large. However he counselled that such acts were perpetrated by a small minority and were not at all in keeping with the real teachings of Islam. He added:

"Peace in society is a two-way process and can only be established if all parties work together towards mutual reconciliation."

His Holiness concluded by calling for peace to be established in the world. He said:

"Today we, the Ahmadiyya Muslim Jamaat, are trying to bring peace in the world. We are playing our role and trying to fulfil our responsibilities in this regard. And so I would request all of you to join us in this task…

We must set aside our own personal desires and instead be concerned for the future existence and well-being of our next generations. We must adopt selflessness rather than selfishness. When we all join together and come to respect each other's feelings and sentiments then and only then will an atmosphere of mutual love develop. It is then that we will truly see the beautiful society that all peaceful people desire."

Press Secretary AMJ International

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

7th February 2012
PRESS RELEASE

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

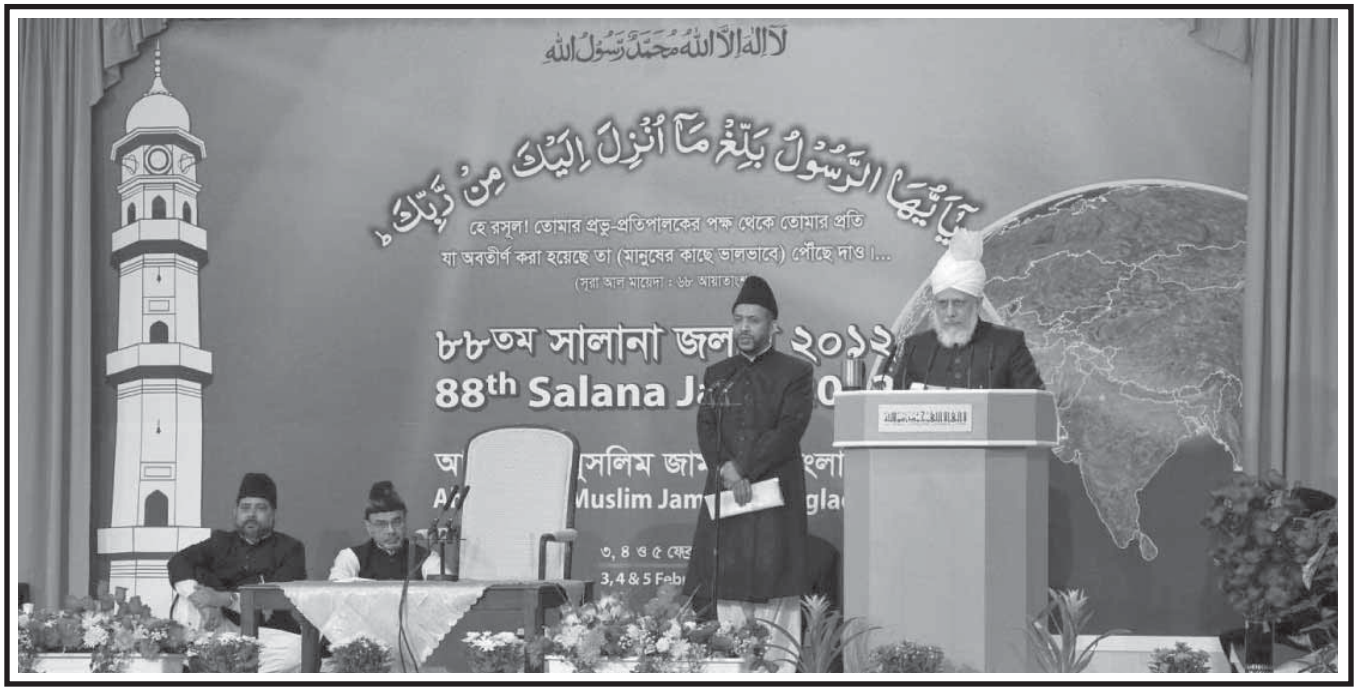

WORLD MUSLIM LEADER SAYS THAT PERSECUTION CAN NEVER HALT AHMADIYYAT'S PROGRESS

88th Jalsa Salana of Ahmadiyya Muslim Jamaat in Bangladesh concludes with powerful address by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad The three-day, 88th Annual Convention (Jalsa Salana) of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Bangladesh concluded on 5th February 2012 in Dhaka with a powerful and faith inspiring address by the World Head of the community, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, who addressed the event from the Baitul Futuh Mosque in London via satellite. The Jalsa attracted over 6,300 people from various countries who attended the event in Dhaka, whilst over 1,500 gathered in London for the concluding session.

The Khalifa used much of his address to speak about the true character of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him). He said it was the Prophet of Islam who took it upon himself to support all those who were vulnerable, be they orphans or those afflicted with poverty. Further, he said that it was the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him), who first gave women their due rights and afforded them the dignity and honour they deserved.

Speaking about the Holy Prophet's desire for

peace and respect for all religions, His Holiness said:

"The Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) counselled his own companions to forsake their own due rights for the sake of establishing peace and reconciliation in the world. And it was he who called for the protection of synagogues, churches and all places of worship in the same way that he called for the protection of mosques."

His Holiness said that non-Ahmadi Muslims regularly alleged that Ahmadis had dishonoured the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) by accepting Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as a Prophet of Allah and as the Promised Messiah.

But the truth was that the Promised Messiah was the greatest servant of the Holy Prophet (peace be upon him) and had spent his entire life advocating total obedience to him and thus his followers were the ultimate defenders of the Holy Prophet (peace be upon him). His Holiness said:

"For the sake of protecting the reputation and dignity of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) we, Ahmadi Muslims, are ready to make every required sacrifice and indeed we are making every such sacrifice for this purpose."

His Holiness spoke also of the so-called 'religious scholars' who had developed huge followings in Muslim countries. He said that instead of bringing people closer to God, such people were poisoning society with their extremist ideology and taking people away from Islam's true teachings.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said that division and discord had penetrated many Muslim countries to such an extent that segments of society were actually publicly stating that it seemed as though they were being punished by God Almighty. He said extremism was also penetrating parts of Bangladeshi society and that such a path could only lead to destruction.

His Holiness said that the extreme clerics failed to take any responsibility for their actions and continually blamed various terrorist groups for the indiscriminate violence being witnessed today in much of the world. But he said the truth was that

such clerics worked hand in hand with terrorists and were continually plotting to harm Ahmadi Muslims and other innocent groups.

Concluding his address with a message to Ahmadis and non-Ahmadis alike, His Holiness said:

"The opponents of our community are trying their utmost to destroy our Jamaat, but they will never be successful. Let it be clear that their efforts can never succeed and indeed their evil plans will soon die a death. The spread of Ahmadiyyat is destined because it is God's Will."

Further information: press@ahmadiyya.org.uk

প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সত্যতায় হাজারো নিদর্শন

(৩য় কিস্তি)

-মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু

১০০ নং নিদর্শন : আমার বিবাহ দিল্লীতে হয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ইলহাম দ্বারা আমাকে জানান, তোমার বংশকেও সম্ভ্রান্ত বানানো হয়েছে।

১০১ নং নিদর্শন : সেই সময়ের কথা, দিলীপ সিং পাঞ্জাবে আসবে এ খবর পত্র-পত্রিকাতে বারংবার ছাপানো হচ্ছিল, আল্লাহ্ আমাকে বলেন আসবে না। তাই হল, সে পাঞ্জাবে আসেনি।

১০২ নং নিদর্শন : আমি সৈয়দ খান সাহেব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে, তিনি আর অল্প দিন বেঁচে থাকবেন। আল্লাহ্ তাকে দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে অল্পদিন পরে ইহধাম থেকে নিয়ে গেলেন।

১০৩ নং নিদর্শন : একবার ডাক বিভাগের মোকদ্দমায় পাঁচ টাকা জরিমানা করা হয়, আল্লাহ্ আমাকে জানান, তুমি বেকসুর মুক্তি পাবে, তাই হল, সকলেই জানলো।

১০৪ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়াতে প্রকাশিত হয় যে, সমস্ত মুসলিম দেশসহ জানানো হয়, 'হে খোদা আমি একা, তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না, আল্লাহ্ আমার জামাতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম করে তা পুরা করলেন।

১০৫ নং নিদর্শন : আব্দুল হক গযনবীর সাথে অমৃতসরে মোবাহালা হয়, তিনি আমার সাথে মোবাহালায় জিদ ধরে এবং আমার ধ্বংস সম্পর্কে বলতে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে প্রভূত কল্যাণে ভূষিত করেছেন।

১০৬ নং নিদর্শন : পৈত্রিক সম্পত্তির ব্যাপারে প্রিয়েমশন (অগ্রক্রয়) মামলা গুরুদাসপুর আদালতে দায়ের করা হলে, আল্লাহ্ বলেন, 'তারা ব্যর্থ হবে তুমি কামিয়াব হবে', সকলকে জানানো হয় এবং আল্লাহ্ এই নিদর্শন পুরা করেন।

১০৭ নং দিনর্শন : একবার লুধিয়ানা হতে পাটিয়ালা যেতে হয়, পথে টাকা হারানো যায় এবং দুষ্ট- লোকের দুষ্টামির কারণে ষ্টেশনে নামা হয় গভীর রাতে, সেখানে আল্লাহ্ অলৌকিক ভাবে সাহায্য করেন।

১০৮ নং নিদর্শন : লুধিয়ানার ধনাঢ্য ব্যক্তি নবাব আলী মোহাম্মদ খান আমাকে বলেন, আমার আয়- রোজগারের পথগুলো বন্ধ হয়েছে, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। পরে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ্ আমাকে জানান, দোয়া গৃহিত হয়েছে, তাই হল, তার আয়ের উৎস বৃদ্ধি পেল।

১০৯ নং নিদর্শন : আল্ হাকাম ও বদরে মুদ্রিত হয়, 'আল্লাহ্ আমাকে জানান, তোমার অনেক বিরোধী- আলেম, মুফতী, তোমার সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ কবরে যাবে'। আল্লাহ্ এ নিদর্শন পুরা করলেন।

১১০ নং নিদর্শন : ১০৯নং নিদর্শন পকাশের পর আমাকে সর্বত্র কুফরী ফতওয়া দানকারী মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর গুরু মৌলবী নজির হোসেন দেহলবীকে আল্লাহ্ ধ্বংস করলেন।

১১১ নং নিদর্শন : মৌলবী আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন, সে আমার বিরুদ্ধে সারা পাঞ্জাবে আগুন জ্বালিয়ে ছিল, আল্লাহ্ তাকেও নিদর্শন করে ছাড়লেন।

১১২ নং নিদর্শন : মৌলবী গোলাম দস্তগীর কাসুরী, যিনি আমার বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া মক্কা মোয়ায্‌যামা হতে আনলো, কিন্তু আল্লাহ্ তাকে নিদর্শন করে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।

১১৩ নং নিদর্শন : লুধিয়ানার মুফতি মৌলবী মোহাম্মদ আমার মোবাহালাকে গ্রহণ করে আমার উপর মিথ্যারোপ করাতে তার এই ভবলীলা সাঙ্গ হল।

১১৪ নং নিদর্শন : মৌলবী আব্দুল্লাহ্, আমার মোবাহালা গ্রহণ করে আমাকে মিথ্যাবাদী বলায়, সেও নিদর্শন দেখলো এবং তারও ভবলীলা সাঙ্গ হল।

১১৫ নং নিদর্শন : মৌলবী আব্দুল আযিয আমার সাথে মোবাহালা করে বলে 'লানাতাল্লাহ্' পরে আল্লাহ্ তাকেও ধ্বংস করে দিলেন।

১১৬ নং নিদর্শন অমৃতসরের শীর্ষ আলেমদের মধ্য থেকে মুফতি মৌলবী রসূল বাবা ও আমার বিরোধিতা করায় আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদানুযায়ী তার ভবলীলা সাঙ্গ হল।

১১৭ নং নিদর্শন : শেখ আব্দুর রহমান সাহেব মাদ্রাজী, তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তার ব্যবসার গোলমালের কথা জানিয়ে দোয়া চান, পরে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করি, আল্লাহ্ আমাকে ইলহামে জানান, 'নষ্ট কাজ ঠিক হবে' আবার বলা হল, 'ঠিক হওয়া কাজ আবার নষ্ট হবে', -তাই হল।

১১৮ নং নিদর্শন : একবার ফজরের নামাযের সময় ইলহাম হল যে, আজ হাজী আর বাবা মোহাম্মদ লস্কর খানের আত্মীয়ের টাকা আসবে' তখন ডাক বিভাগকে সহ সকলকে জানানো হল, টাকা আসলো এবং পরে প্রমাণ হল, আমার প্রতি আল্লাহ্‌র ইলহাম সত্য।

১১৯ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়ার ২৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়, "১৮৮১ ও ১৮৮২ সালে আল্লাহ্ আমাকে জানান, আল্লাহ্ তাআলার আশিষ তোমার উপর সকল পথ দিয়ে আসবে, আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে, বিপুল সংখ্যায় লোক সকল তোমার নিকট আসবে" আজ ২৫ বৎসর পর আল্লাহ্ এই নিদর্শন চারিদিক থেকে পুরা করলেন।

১২০ নং নিদর্শন : আমি ১৯০৪ সালে করমদীনের ফৌজদারী মামলার দরুন

ঝিলামে যাচ্ছিলাম, পথে আল্লাহ্ ইলহাম করে জানালেন যে, প্রত্যেক দিক থেকে আল্লাহ্ আমাকে কল্যাণ দেখাবেন"। কোর্টে ভীড় ছিল সেখানে আল্লাহ্‌র ইলহাম অনুযায়ী সেই সফরে ১১০০ (এগারশত) লোক বয়আত করলো তার মধ্যে ২০০ জন মহিলাও ছিল। এভাবে আল্লাহ্ আমার ইলহামকে পুরা করে দেখালেন।

১২১ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়ার ৪৯০ পৃষ্ঠায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, খোদা তাআলা তোমার সম্মান বৃদ্ধি করবেন। তুমি তোমার বাপ-দাদার নামে পরিচিত হবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী পুরা হল জগতের মানুষ জীবন্ত সাক্ষী।

১২২ নং নিদর্শন : একবার কাদিয়ানসহ চারদিকে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে মৌলবী মোহাম্মদ আলী এম, এ ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। তিনি মুফতি মোহাম্মদ সাদেককে মৃত্যুপথ যাত্রী হিসেবে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সংবাদ পেয়ে আমি দেখার জন্য গেলাম ও তাঁর শরীরে হাত রাখলাম, পরে তাঁর শরীর ঠান্ডা হল, জ্বরের চিহ্ন আর রইল না।

১২৩ নং নিদর্শন : আমার ছোট ছেলে মোবারক আহমদ সম্পকে পরিবারের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হলো যে, সে মারা গেছে। আমি খোদার দরবারে প্রণত হই এবং কিছুক্ষণ পরে ছেলে নি:শ্বাস নিতে আরম্ভ করলো, আল্লাহ্ তাঁকে পূর্ণ সুস্থ করলেন।

১২৪ নং নিদর্শন : আমার বড় ভাই মির্যা গোলাম কাদের কঠিন রোগে অসুস্থ হয়ে পরেন। আমাকে স্বপ্নে দেখানো হল, বড় জোর আর পনর দিন জীবিত থাকবে"। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলাম । আল্লাহ্ আমার দোয়া কবুল করলেন এবং আমার বড় ভাইকে সুস্থ করলেন এবং তাঁকে দীর্ঘজীবি করলেন।

১২৫ নং নিদর্শন : একবার রূপকভাবে আল্লাহ্‌র সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় এবং আমি কিছু বিষয় লিখে দিলে তিনি নি:সংকোচে লাল কালি দ্বারা দস্তখত করেন। তিনি দস্তখত করার সময় কলম ঝাড়া দিলেন, কালির ফোঁটা আমার জামা ও মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানৌরীর টুপিতে পড়ে। আমার জামা তবারক হিসাবে রেখে দেন সানৌরী সাহেব।

১২৬ নং নিদর্শন : ১৯০৬ সালে দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে একটি ভয়ংকর ভূমিকম্প হয় এবং বহু বড় বড় শহর গ্রাম ধ্বংস হয়, হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। এই ভূমিকম্পের কথা আগেই আমকে জানানো হয়।

১২৭ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখা আছে, "আল্লাহ্ বলেন, পৃথিবীতে আদমকে খলীফা বানাতে মনস্থ করেছি। এরপর আল্লাহ্ আদমের পদতলে সকলকে একত্র করবেন এবং মিথ্যাকে স্বীয় পায়ের নিচে পিষে ফেলা হবে"।

১২৮ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়ার ৫৫৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "তুমি এ যুগের ইউসুফ, তোমার উপর দয়া করা হবে, যেরূপে ইউসুফের উপর দয়া করা হয়েছিল। তোমার ভ্রাতৃত্বের মোকাবেলায় তোমাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে"।

১২৯ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়ার ৫৫৬ পৃষ্ঠায় আল্লাহ্ পূর্বেই জানান, "আমি তোমাকে একটি বড় জামাত দান করবো"। আজ সারা জগতের মানুষ সাক্ষী।

১৩০ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়ায় লেখা আছে, আল্লাহ্ আমাকে পূর্বেই জানান "আমি আমার চমক দেখাবো। আমি আমার শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উঠাবো"। হে জগতবাসী! এখনই সময়, ভেবে দেখা প্রয়োজন।

১৩১ নং নিদর্শন : গুরুদাসপুর কোর্টে আমাদের একটি মোকদ্দমা ছিল। সেটার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখানো হল যে, মোকদ্দমা ডিক্রী হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাই করে দেখালেন।

১৩২ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়ায় লেখা আছে, খোদা তাআলা পূর্বেই জানালেন, দু'টি ছাগলকে যবাই করা হবে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা পরিশেষে সকলেই মরবে। তারা হলেন কাবুলের শাহজাদা আব্দুল লতিফ ও শেখ আব্দুর রহমান।

১৩৩ নং নিদর্শন : প্লেগ বিস্তৃত হওয়া সম্পর্কে ইলহাম মোতাবেক পাঞ্জাবে আবার প্লেগ দেখা দিল এবং হাজার হাজার মানুষ মারা গেল।

১৩৪ নং নিদর্শন : আবার আল্লাহ্ জানালেন, "প্লেগ আসবে, তুমি এ যুগের মসীহ্, তোমার দিকে সকল মানুষ প্লেগের ভয়ে দৌড়িয়ে আসবে" আল্লাহ্ তাই করলেন, আমার পুস্তক 'সিরাজুম মুনিরে' একথা লিখা আছে।

১৩৫ নং নিদর্শন : আল্লাহ্ আমার হৃদয়ে উদ্রেক করলেন যে, 'ডেরা ইসমাইল খানের আব্দুল্লাহ্ খান এর পক্ষ থেকে কিছু টাকা আসবে আজ'। আমি সকলকে জানালাম, ঘটনা তাই ঘটলো।

১৩৬ নং নিদর্শন : একবার মালাওয়ামাল নামক এক আর্য ব্যক্তি যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার কাছে আসলো এবং দোয়া চাইল, আমি দোয়া করাতে সে রোগমুক্ত হল।

১৩৭ নং নিদর্শন : আমার পুস্তক 'তিরিয়াকুল কুলুবে' লিখিত আছে, করমদীন ঝিলামীর মোকদ্দমার ব্যাপারে আমার কাছে ইলহাম হল এবং সে মোতাবেক আল্লাহ্ ইলহামটি পূর্ণ করে দেখালেন।

১৩৮ নং নিদর্শন : আমার চাচাতো ভাই ইমাম উদ্দিন, একজন কট্টর বিরোধী সে ১৯০০ সালে আমার ঘরের সম্মুখে একটি দেওয়াল উঠালো। এতে আমার মসজিদে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। এর মুকাবেলায় আল্লাহ্ আমাকে বিজয়ের সুসংবাদ দান করলেন এবং সে মোতাবেক আমাকে বিজয়ী করলেন।

১৩৯ নং নিদর্শন : লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ্ আমাকে জানান যে, "শ্রীঘ্রই আঞ্জুমানওয়ালারা আমার কথা স্মরণ করবে, এই পন্থা অবলম্বনের মধ্যে ব্যর্থতা আছে"। আল্লাহ্ এই ইলহামকে পুরা করেন।

১৪০ নং নিদর্শন : ১৯০২ সালের ৪ঠা এপ্রিলের দিনগুলোতে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। আমার শিষ্য আব্দুর রহমান নামক এক ব্যক্তির জ্বর ছিল, আল্লাহ্ আমাকে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র জানান। সে-মাফিকই ব্যবস্থা দেওয়া হয়, যা স্বপ্নে জানানো হয়েছিল। ইলহামে আল্লাহ্ জানান, "তার রোগ কেহ বুঝতে পারছে না, তুমি জানাও, তার রোগ যকৃতের। তাই করা হলো, আল্লাহ্ তাঁর ইলহাম পুরা করলেন।

১৪১ নং নিদর্শন : আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ফেরেশ্‌তা আমাকে ডেকে বললো, "এই রুটি নাও। এই রুটি তোমার জন্য ও তোমার সাথের দরবেশদের জন্য"। কাদিয়ানের লঙ্গরখানাতে প্রত্যেক দিন শত শত মানুষ রুটি খায় আর নিয়েও যায়।

১৪২ নং নিদর্শন : এক হিন্দু ভদ্রলোক স্বামী সুগান চন্দ্র এসে সর্বধর্ম সম্মেলনের আহ্বান করে। সেই উদ্দেশ্যে একটি প্রবন্ধ লিখলাম, আল্লাহ্ আমাকে ইলহাম করে জানান 'তোমার প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ হবে'। লাহোর টাউন হলে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় এবং আমার প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ হয়।

১৪৩ নং নিদর্শন : বারাহীনে আহমদীয়া প্রণয়ন যুগে অর্থের খুব প্রয়োজন দেখা দিল। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ ইলহাম করেন। দশ দিন পরে টাকা আসবে অর্থাৎ একাদশ দিনে টাকা নিশ্চিত আসবে মোতাবেক তাই হল, আল্লাহ্ আমার পরিচিতি দুনিয়াতে তুলে ধরলেন।

(চলবে)

লেখক: মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ

মা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি এক সূত্রে গাঁথা

মাহমুদ আহমদ সুমন

মাতৃভাষা হলো মায়ের ভাষা। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। মানুষের অস্তিত্বের প্রধান তিনটি অবলম্বনই হচ্ছে–মা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি। মানুষের জীবন হচ্ছে তার মাতৃভাষা, দেশের ভাষা, জাতির ভাষা। ভাষা সমাজ গড়ে, আবার সমাজও ভাষা গড়ে। তাই কোন জাতির ভাষা দ্বারা তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীতে মানব বংশের বিচিত্রতা এবং মানুষের বৈচিত্রময় রং, রূপ, দেহসৌষ্ঠবের পার্থক্য যেমন মেনে নিতে হয়, তেমনি তাদের ভাষার পার্থক্যও মানতে হয়। ভাষাকে আল্লাহ্ তাআলার মহান সত্তাকে চেনা-জানা ও তাঁর বিশাল কুদরতকে বুঝার নিদর্শন বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে রয়েছে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের বিভিন্নতাও। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে' (সূরা আর রূম :২৩)। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সকল ভাষার সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই। মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই মানবজাতির মধ্যে ভাষার বৈচিত্র প্রদান করেছেন। আর আল্লাহ্ যেহেতু এমটি চেয়েছেন, তাই পৃথিবীর যে কোন ভাষাই আল্লাহ্‌র বিশেষ উদ্দেশ্যেরই বাহক বলা চলে। আবার ফিরে এসেছে রক্তঝরা সেই মাস, শিমুল-পলাশ ফোটার মাস। এ মাসে আমাদের প্রত্যয় হোক, সর্বস্তরে আমরা মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা করব। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি...। সেই অমর একুশে ফেব্রুয়ারি মাস এই ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের এই মাসের ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' এ দাবিতে বাঙালিরা যখন রাজপথে নেমে এসেছিল, তখন পাকিস্তানিরা তার জবাব দিয়েছিল বুলেটের মাধ্যমে। বাংলার দামাল ছেলেরা মাতৃভাষা বাংলার জন্য বুকের তাজা রক্তে রাজপথ করেছিল রঞ্জিত। সেই রক্তের ছোঁয়া পেয়ে আশ্চর্য দ্রুততায় গোটা জাতি জেগে উঠেছিল তার শেকড়ের টানে। পাকিস্তানিদের সৃষ্টি করা সাম্প্রদায়িকতা তাতে কোন বাদ সাধতে পারেনি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি সেদিন এক হয়ে একটিই প্রতিজ্ঞা করেছিল- মায়ের ভাষার সম্মান রাখবই, নিজের সংস্কৃতিকে ধারণ করবই।

রক্তের বিনিময়ে এ বাংলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা। এক ঝাঁক থোকা থোকা নাম সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারের মতো অনেকের জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালি তাঁর ভাষা, স্বকীয়তা এবং গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিল।

রক্তের আখরে লেখা এই ২১শে ফেব্রুয়ারি । ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির নবতর উত্থান ও অভ্যুদয়ের দিন। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সংস্কৃতির হৃৎপিন্ড। বাঙলা আমাদের দেশমাতৃকা, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা আমাদের প্রিয় ভাষা। বাংলা ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সবার মাতৃভাষা। এই ভাষার মর্যাদার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল ধমাবলম্বীদের রয়েছে অবদান।

আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে মর্যাদায় উন্নীত করতে ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক কিছু, দিতে হয়েছে লাখ প্রাণের তাজা রক্ত। মাতৃভাষার জন্য বুকের রক্ত দেয়ার যে ইতিহাস বাংলার বীর সেনারা সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে আর এমন দৃষ্টান্ত নেই। বুকের তাজা রক্তের আখরে সৃষ্টি বাংলাভাষা, সময় পরিক্রমায় ৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বন্যায় এবং ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত আব্রুর বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন এই বাংলাদেশ।

বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা। এই ভাষার জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থকতা। একুশে ফেব্রুয়ারি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালিদের ঐক-চেতনার অগ্নিস্মারক। এই এক অবিনাশী, অনশ্বর-চৈতন্যের জ্যেতির্ময় শিখা।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে পাকিস্তানের তৎকলিন সময়ের প্রখ্যাত ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য ধর্মীয় নেতা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা, **হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) পাকিস্তানী শাসক মহলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা পূর্ব পাকিস্তানে উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করো না। এতে পাকিস্তানের অখন্ডতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাঝে ভাষার জন্য আলাদা মমত্ত ও ভালবাসা রয়েছে।"** (দৈনিক আল ফযল, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৭)

সেই মহান ধর্মীয় নেতাকে বাঙালি লাখ জনতার পক্ষ থেকে লাখ সালাম। জান্নাতে তাঁর পদমর্যাদা আরও উন্নত হোক। তিনি তখন তার দিব্য দৃষ্টি দিয়ে পাকিস্তানের ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং শাসক মহলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী' তদ্রুপ শাসকদের কাছে এ সতর্ক বাণীর কোন মূল্যই ছিল না তখন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা ও মহান ধর্মীয় নেতার উপদেশটির মধ্যে ৪টি বিষয় ছিল। প্রথমত মাতৃ ভাষায় শিক্ষাদান, দ্বিতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানের ওপর উর্দুকে চাপিয়ে না দেয়া, তৃতীয়ত উর্দু নিয়ে বারাবারি করলে

পূর্বাঞ্চলটি পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে, শেষটি হলো, বাঙালিরা বাংলা ভাষাকে বিশেষভাবে ভালবাসে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী উর্দুভাষী খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫২-র ২৬শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে এক জনসভায় রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে বলে উঠলেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" এই ঘোষণা শোনার পর এর প্রতিবাদে বীর বাঙালিরা রাস্তায় নেমে এলো। ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা মায়ের দামাল সন্তানেরা প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার জন্য জীবন বিলিয়ে দিল। বাধ্য হয়ে সরকার বাংলা এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে কাগজে কলমে স্বীকৃতি দান করলো। কিন্তু আন্দোলন থামলো না। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত নানারূপে আন্দোলনের ধারা চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত এক সাগর রক্তের বিনিময়ে জন্ম নিলো স্বাধীন বাংলাদেশ। আমরা ফিরে পেলাম আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে।

এ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, তাহলো অমর এ রক্তাক্ত একুশের বিশ্ব স্বীকৃতি। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ রোজ বুধবার প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান সংস্থা UNESCO (ইউনেস্কো) ২১শে ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে ঘোষণা দিয়ে এবং তা ২০০০ সাল হতে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা নিয়ে বাঙালি জাতিকে বিশ্বে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এ মহান কার্যাদি একদিনে সুসম্পন্ন হয়নি এর জন্য অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।

আজ আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়, পৃথিবীর সকল দেশের জনগণ প্রতি বছর এ নদী বিধৌত পলি মাটির মনুষ্যত্ব আর গণতান্ত্রিক সমর্থনে সাধারণ মানুষ কতটা নিবেদিত প্রাণ ও দেশ প্রেমিক হতে পারে এবং কতটা আত্মত্যাগী হতে পারে এ বিষয়ে জানছে এবং আরও জানবে। সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার আর একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদ ও দু'লাখ মা বোনের ইজ্জত হারানো শাশ্বত এ বাঙ্গালীর রক্তের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠা বাংলাদেশ, আজ পরম শ্রদ্ধার দেদীপ্যমান সারা বিশ্বের জনগণের কাছে।

অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত শস্য শ্যামল সবুজের সমারোহে ভরা নয়ন জুড়ানো আমার সাধের বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের প্রতিটি ভাষাভাষীর মানুষের গর্বে ধন্য ও প্রাণের সম্পদ। স্বাভাবিকভাবে একুশ আজ প্রতিটি বাঙালির অহংকারের প্রতীক। একুশ প্রতিটি স্বাধীনতাকামী বাঙালির গর্ব, সাহস ও প্রেরণার উৎস। 'ইউনেস্কো'-এর সুদূর প্রসারী সিদ্ধান্তের ফলে একুশ আজ গোটা বিশ্বের সম্পদে দাঁড়িয়েছে।

প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের স্বীয় মাতৃভাষার মর্যাদা অপরিসীম। আমরা জানি পৃথিবীতে যত নবী রাসূল এসেছেন তাঁরা সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই তাদের প্রচার কার্য চালিয়েছেন। কুরআনের বর্ণনামতে জানা যায় সকল ভাষা আল্লাহ্‌রই দান। সকল জাতিতে যেমন রাসূল এসেছেন, তেমনি সকল জাতির ভাষাতেই ওহী ইলহাম নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জাতির স্বীয় মাতৃভাষাকে যথাযত মর্যাদা দিয়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় প্রধান চারটি আসমানি কিতাবের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি 'তাওরাত' হিব্রু ভাষায়, হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি 'ইঞ্জিল' সুরিয়ানী ভাষায়, হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি 'যাবুর' ইউনানী ভাষায় এবং বিশ্ব ও শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি 'আল কুরআন' আরবী ভাষায় নাযিল হয়। হযরত রাসূল করীম (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবী। তাঁর কাছে মানবজাতির দিশারী এবং সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে সর্বশেষ আসমানী কিতাব 'আল কুরআন' অবতীর্ণ হয়। এ ঐশী ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী। বিশ্ব নবীর মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন, "আমি কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা দিয়ে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার" (সূরা মরিয়ম ঃ ৯৮)।

তাই আমরা বলতে পারি কোন ভাষা অপবিত্র নয় বরং সকল ভাষাই ঐশী ভাষা। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাতৃভাষাকে বিশেষ গুরূত্ব ও সম্মান দিয়ে থাকে, আর আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতাও মাতৃভাষার ওপর অত্যন্ত গুরূত্ব দিয়েছেন। যেমন তিনি এক স্থানে উল্লেখ করেছেন, "নামাযের মধ্যে নিজের ভাষায় দোয়া করা উচিত। কেননা, নিজের ভাষায় দোয়া করলে পূর্ণ আবেগ সৃষ্টি হয়" (মালফুযাত, নবম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৪)।

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, "নামায আশিস মন্ডিত হবে না যতক্ষণ না নিজের ভাষায় নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা না কর। ...মাতৃভাষায় মানুষের বিশেষ এক সাধ মিশ্রিত থাকে। এ জন্য নিজের ভাষায় অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সঙ্গে নিজের কামনা-বাসনাকে রাব্বুল আলামীনের কাছে নিবেদন করা উচিত" (মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৫)।

তাই প্রত্যেক আহমদী মুসলমান কুরআন হাদীসের নির্ধারিত আরবী দোয়াগুলো পাঠ করার পর নিজ নিজ মাতৃভাষায় সেজদায় অবশ্যই দোয়া করে থাকে। এছাড়া সারা বিশ্বের আহমদীয়া জামা'তের মসজিদগুলোতে জুমুআর খুতবাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রদান করে থাকে। যার ফলে এটাই প্রতিয়মান হয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নিজ মাতৃভাষাকে কত বেশি মূল্যায়ন করে।

বাঙলা বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৫ম ভাষা। আর আমাদের রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা। এ ভাষার প্রগতি, উন্নতি উৎকর্ষের জন্য কারো কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তের বিনিময়ে বাঙালি খুঁজে পায় নিজস্ব সত্তা। আর এর ফলেই বাঙালি লাভ করে স্বাধীন রাষ্ট্র।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে নিজ মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমতার বন্ধন সৃষ্টি করে দিক আর আজকের দিনে বাঙালি সংস্কৃতির নামে যে বেহায়াপনা করা হচ্ছে তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। গভীর ভাবে শ্রদ্ধা জানাই সেই সব বীর শহীদ ও বীর সৈনিকদের যারা এ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং লড়েছেন। মানুষই পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী, যার ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা আছে। ভাষার মাধ্যমে আমরা যত সুন্দর ও সহজভাবে ভাব প্রকাশ করতে পারি, তা অন্য কোন মাধ্যমে সম্ভব নয়। ভাষা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ নেয়ামতগুলোর অন্যতম নেয়ামত। তাই আমরা যেন আমাদের লেখায়, কথায়, চলনে-বলনে মাতৃভাষাকে আরও বেশি করে বিশুদ্ধভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করি আর আমরা যেন আল্লাহ্ তাআলার এই নেয়ামতের যথাযথ কদর করতে পারি।

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী
খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(দশম কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

তাঁর তবলীগ

মোবারক আলী সাহেব ১৯০৯ সালে কাদিয়ানে বয়আত করার পর জামাতের কাজে ফানাফিল্লাহ্ হয়ে যান। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ বঙ্গদেশের বাঙালিদের নিকট প্রচার ও প্রসারে ব্রত হন। পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তবলীগই তাঁর জীবনের চাওয়া পাওয়া ও স্বপ্ন সাধনায় পরিণত হয়। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা–হে রসূল! তোমার প্রভুর কাছ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা (লোকদের কাছে) পৌঁছে দাও এবং যদি তুমি এরূপ না কর তাহলে তুমি তাঁর পয়গাম আদৌ পৌঁছালে না এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কবল হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের জাতিকে হেদায়াত দান করেন না (আল-মায়েদা : ৬৮)।

তাই বয়আত করে বগুড়ায় নিজ বাড়ি আসার পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতা অকপটে প্রচার করতে থাকেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তাঁর প্রচারণা প্রসার লাভ করে। দিগদাইড় নিজ গ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামে এর সুবাতাস বইতে থাকে। যারা বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জাহির হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর হাতে বয়আত করার প্রয়োজনীয়তা শুনেছেন তাদের নিকট এর ইতিবাচক প্রভাব পরে। কিন্তু ধর্ম জগতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে বিরোধিতা শুরু হয়। এলাকার মৌলভীরা কুফরী ফতোয়ার ঝড় তোলে। কিন্তু তিনি ঈমান ও আমলের দৃঢ়তায় আহমদীয়াতকে আগলে ধরে এগিয়ে গেছেন। তাদের সাথে বীরত্বে একাই বহাসের মোকাবেলা করেন। তখন পূর্ববঙ্গে তিনি ব্যতীত তিন জন আহমদী থাকলেও তাদের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল না। তাঁরা হলেন (১) চট্টগ্রামের হযরত আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ (রা.), (২) কিশোরগঞ্জের হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.) এবং (৩) হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.) এর বেগম সাহেবা। তিনি বিশ্বাস করতেন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা–নিশ্চয় তোমাদেরকে তোমাদের ধনসম্পদ এবং জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে এবং যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কাছ হতে এবং যারা শির্ক করেছে তাদের নিকট হতেও তোমরা নিশ্চয় পীড়াদায়ক কথা শ্রবণ করবে। এমতাবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তাহলে এটা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পের বিষয় হবে (আলে ইমরান : ১৮৭)।

একবার একদল মৌলভী তাঁর পিতা আরজ উদ্দিন সাহেবের নিকট অভিযোগ করেন– "আপনার ছেলে মোবারক আলী কাদিয়ানী হয়ে অমুসলমান হয়ে গেছে। কাফের হয়ে গেছে। তাঁর সাথে কোন মুসলমানের সম্পর্ক রাখা যাবে না। তখন পিতা উত্তরে বলেন–সে তো আগে নিয়মিত নামায পড়তো না, কুরআন পড়তো না, এখন দেখি নিয়মিত নামায পড়ে, কুরআন পড়ে, ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করে। মানুষকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা পালনে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামের প্রতি তাঁর মহব্বত বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং আমি তো দেখি যে আগের চেয়ে ভাল মুসলমান হয়েছে"।

১৯১৪ সালের রমযান মাসে ঈদ উপলক্ষ্যে তিনি পিতা ও ছোট ভাইয়ের সাথে কাদিয়ান থেকে বগুড়া চলে আসেন। তখন সোনারায় গ্রামের মৌলভী জাকের মোহাম্মদ এবং তার ছেলে একরাম আলীকে আহমদীয়াতের সত্যতার উপর অনেক তবলীগ করা হয়। মৌলভী জাকের মোহাম্মদ জ্ঞাতীতে মোবারক আলীর ফুফা এবং তার ছেলে ভগ্নীপতি হতেন। মৌলভী সাহেব একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনি সোনরায় গ্রামের ঈদগাহের ইমাম ছিলেন। তাদের সাথে আলোচনায় আহমদীয়াতের সত্যতার ইতিবাচক প্রভাব পরে। ফলে জাকের মোহাম্মদ সাহেব মোবারক আলীকে বলেন–'সোনারায় মাঠে এবার ঈদের নামায আমার পরিবর্তে তুমি পড়াবে'। তখন মোবারক আলী সাহেব চার/পাঁচ হাজার মুসল্লীর উপস্থিতিতে ঈদের নামায পড়ান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর শিক্ষার আলোকে সূরা ফাতেহার তফসীরের উপর খুতবা প্রদান করা হয়। ইসলামের সিরাতাল মোস্তাকিম লাভের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এতে মুসল্লীরা ব্যতিক্রমধর্মী স্বাদ পান। নতুন দিগন্তের উন্মুচন হয়। মৌলভী জাকের মোহাম্মদ আবেগাপ্লুত হয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, "আজ আপনারা যে খুতবা শুনেছেন এটা আমল করবেন। এতে পঞ্চাশ বছরের এবাদতের সওয়াব হবে"। ঈদের নামাযের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

এতদাঞ্চলে আহমদীয়াতে পরিচিতির প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

কাদিয়ান প্রেমিক ও তবলীগ পাগল মোবারক আলী এর কিছুদিন পর ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে পুণরায় কাদিয়ান চলে যান। বগুড়ার সোনারায় গ্রামের মাঠে ঈদের নামায পড়ানোর বিষয়টি হুযূর (রা.)-এর নিকট পেশ করেন। এতে হুযূর খুশী হন। তখন তিনি হুযূরের নিকট আরজ করেন–"হুযূর আমার বোধ হয়, এ সময় কোন বড় আলেমকে সাথে নিয়ে যদি সমস্ত বাংলাদেশ একবার ঘুরতে পারি তাহলে আল্লাহ্ ফজলে এর ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। হুযূর (রা.) একথা শুনে আমার প্রস্তাবে রাজী হন এবং বলেন-'হাফেজ রৌশন আলী সাহেবকে আপনার সাথে দিব। আপনি তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলিতে একবার তবলীগি সফর করে আসেন'। ক'দিন পর আমি হযরত হাফেজ সাহেব (রা.)সহ কাদিয়ান থেকে রওয়ানা হই। তিনি একজন যুবক আলেম এবং কুরআন, হাদিস ও রূহানীয়তের তত্ত্বজ্ঞান তাঁর মাঝে ভান্ডার ছিল। তাঁর দৃষ্টিশক্তি অতি সামান্য ছিল। কিন্তু তিনি শুধু কুরআনে হাফেজ ছিলেন না, সিয়া সাত্তার হাদিস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিতাবের জ্ঞানেও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি একটি কিতাবও সাথে নিলেন না। বড় বড় আলেমদের সাথে যখন কথাবার্তা হতো তখন আবশ্যকীয় যে কোন কিতাব হতে দরকারী বচনগুলি মুখস্তই উদ্ধৃতি করতেন। এমন কি অধ্যায় ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করতেন (পাক্ষিক আহমদী ৩০ জুন ১৯৬৫)।

হাফেজ রৌশন আলী সাহেবকে নিয়ে মোবারক আলী সাহেব বঙ্গদেশের কোলকাতা, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল প্রভৃতি শহরে চষে বেড়ায়েছেন। অনেক তবলীগি সভা করেন। প্রথমে বগুড়া শহরের সাতানীর মসজিদ প্রাঙ্গনে এক তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। এতে অনেক লোকের সমাগম হয়। হাফেজ রৌশন আলী সাহেব হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আবির্ভাবের উপর অকাট্য যুক্তির সারগর্ভ বক্তব্য শুরু করেন। কিন্তু বিরোধীবাদীদের শুধু বিরোধিতার কারণে আশানুরূপ সফল সভা করা সম্ভব হয়নি। বগুড়া জেলা স্কুলের মৌলভী শিক্ষক মৌলভী মাহমুদ উল্লাহ্ বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব দেন। অত:পর মিউনিসিপাল স্কুলে এক তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু তাদের অপপ্রচারণার কারণে সফল সভা করা সম্ভব হয়নি। পরে দিগদাইড় গ্রামে নিজ বাড়ি যান। সেখানে নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে প্রাণবন্ত তবলীগি আলোচনা হয়। ফলে তাঁর মাতা ও ছোট বোন আয়েশা বেগম এবং আত্মীয় আব্বাস আলী বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

পরে সোনারায় গ্রামে মৌলভী জাকের মোহাম্মদ সাহেবের বাড়ি যান। সেখানে তাঁদের পরিবারের লোকদেরকে জড়ো করে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আবির্ভাবের সত্যতা প্রচার করেন। ফলে মৌলভী জাকের সাহেব, তার স্ত্রী এবং একরাম আলীসহ তার চার ছেলে ও একরাম আলীর স্ত্রী অর্থাৎ মোবারক আলী সাহেবের বোন হযরত হাফেজ রৌশন আলীর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তিনি হাফেজ সাহেবকে নিয়ে বগুড়া থেকে ময়মনসিংহ যান। তখন ময়মনসিংহ গভর্নমেন্ট প্লিডার এবং জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব। তাঁর সাথে সাক্ষাতে দীর্ঘ আলোচনা হয়। উল্লেখ্য ইসমাঈল সাহেব ছিলেন আমাদের দ্বিতীয় বাঙালি আহমদী হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.)-এর ভাগ্নে। তাই আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে তিনি পূর্ব থেকে অবগত ছিলেন। ফলে তাঁর সাথে সৌহার্দপূর্ণ ও প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। তখন ইসমাঈল সাহেব বলেন– "আমার এক মামা রইস উদ্দিন খাঁ সাহেব আপনাদের জামাতের সদস্য। তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহ শহর থেকে ৫০/৬০ মাইল দূরে নাগের গাঁও অবস্থিত"। তখন হযরত হাফেজ রৌশন আলী সাহেব অত্যন্ত খুশী হয়ে বলেন–"এমন বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করা প্রয়োজন। কিন্তু মফস্বলে এত দূরে গ্রামে আমাদের যাওয়া সম্ভব নয়।" অত:পর হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রচারে ময়মনসিংহ কলেজ হোষ্টেলে এক তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। এতে ছাত্র শিক্ষক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।

পরে ঢাকা চলে আসেন। নবাব সলিমউল্লাহকে তবলীগ করার উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে যান। তখন নবাব সাহেব সাক্ষাৎ দেননি। তিনি পরদিন আসার জন্য জানান। তার উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা শহরের বড় বড় আলেমের সাথে কাদিয়ানী মাওলানার বহাসের ব্যবস্থা করে সত্যতা যাচাই করা। তাই তিনি ক'জন আলেমকে ডেকে বহাসের কথা বলেন। আলেমরা তা শুনে নবাব সাহেবকে বলেন–'কাদিয়ানীরা ভন্ডনবীর (নাউযুবিল্লাহ্) দাবীদার। তারা কাফের। তাদের সাথে কোন মুসলমানের কথা বলা জায়েজ নয়। কাজেই কাদিয়ানীদের সাথে নবাব সাহেবের সাক্ষাৎ না দেওয়া ও কথা না বলা ভাল'। পরদিন আশেকে মসীহ্গণ নবাব বাড়িতে গেলে নবাব সাহেব অসুস্থতার অযুহাতে কথা বলেন নি। ফলে সেকালের ঢাকার প্রভাব প্রতিপত্তিশালী নবাব সলিমউল্লাহ্র কপালে আহমদীয়াতের রাজটিকা লাগেনি। যুগ-ইমামের আনুগত্য স্বীকারে সিরাতাল মোস্তাকিম হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।

পরে আশেকে মসীহ্গণ ঐশীবাণীর পরশ বিলিয়ে দিতে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় যান। ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা পুরাতন ঢাকার বাহাদুরশাহ পার্ক সংলগ্ন ১৮৭৩ সালে হাজী মোহাম্মদ মহসীন ট্রাষ্টের অর্থায়নে স্থাপিত হয়। ১৯৫২ সালে আলীয়া মাদ্রাসা বকশীবাজারে স্থাপনের পর পুরাতনটি বন্ধ করে দেয়া হয়। সেখানে কবি নজরুল সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তবলীগ পাগল বুযুর্গরা সে সময় মাদ্রাসার প্রিন্সিপালসহ ক'জন শিক্ষকের নিকট হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রচার করেন। পবিত্র কুরআন হাদিসের অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে সত্যতা বর্ণনা করা হয়। তখন পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মাদ্রাসার ছাত্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসাইট গ্রামের সুবোধ বালক জিল্লুর রহমান। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব কর্তৃক আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে তাঁর বিরূপ ধারণা থাকলেও হযরত হাফেজ রৌশন আলী সাহেবের বক্তব্য শুনে তাঁর ইতিবাচক প্রভাব পরে। আহমদী বুযুর্গদের বলেন, 'আপনাদের কথা শুনে ভাল লেগেছে। আমি আপনাদের জামাতের পুস্তক অধ্যয়ন করবো'। অত:পর তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে মাওলানা ওয়াহেদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে আহমদীয়া জামাতের সত্যতা যাচাই করেন। ফলে ১৯১৬ সালে সিলসিলায় দাখিল হন। পরবর্তী জীবনে তিনি জিন্দেগী ওয়াকফকারী মোবাল্লেগ ছিলেন এবং আমরণ জামাতের নিরলস খেদমত করেছেন। কিন্তু মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও অন্য শিক্ষকরা ধর্মীয় জ্ঞানে অধিক জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তাদের আহমদী হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।

(চলবে)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসা হাজারো ধর্মপ্রাণ সদস্যদের উপস্থিতি এবং যুগ-খলীফার তাজা নির্দেশনার মধ্য দিয়ে ব্যপক সফলতার সাথে সমাপ্ত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন
মোহতরম মওলানা মাহমুদ আহমদ, হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি

মহান খোদা তাআলার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসা গত ৩-৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় কার্যালয় বকশী বাজারে অনুষ্ঠিত হয়।

জলসার কার্যক্রম শুরু হয় ৩ ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার বিকাল ৩টায় মোহতরম মওলানা মাহমুদ আহমদ, হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির সভাপতিত্বে। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মশিউর রহমান। উদ্বোধনী ভাষন ও দোয়া পরিচালনা করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। এরপর উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব মামুন উর রশীদ। এ পর্যায়ে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

বক্তৃতা পর্বে মহান আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের স্বরূপ ও নিদর্শন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলনা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। এরপর পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ। জলসার এ পর্যায়ে খিলাফতের ডাক ও আমাদের কর্তব্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ৪ ফেব্রুয়ারী রোজ শনিবার সকাল ৯-৩০ মি: থেকে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকা। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সেলিম আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব মাহবুবুর বক্তৃতা পর্বে নামাযে স্বাদ পাওয়ার উপায় এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান। এরপর 'বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে ইসলামী শিক্ষা ও আমাদের করণীয়' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এরপর আদর্শ ইসলামী পারিবারিক জীবন, সন্তানের তরবিয়তের মূল সূত্র এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ব বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। এ পর্যায়ে ইসলামে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. তারেক সাইফুল ইসলাম, সাবেক নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

এরপর বাংলাদেশের আহমদীয়াতে শতবর্ষপূর্তিতে ঐতিহ্য ও অর্জন বিষয়ে

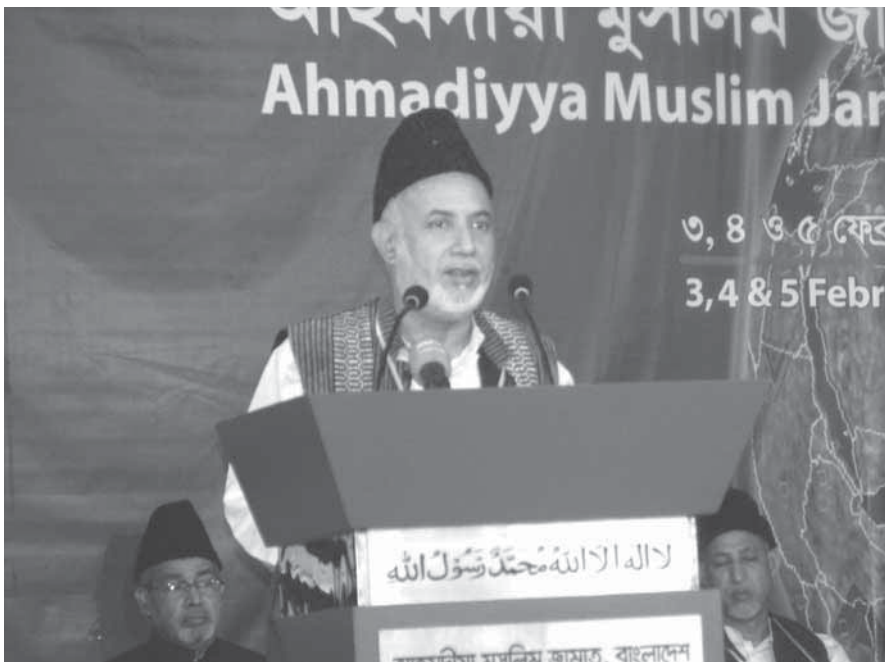

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

বক্তব্য রাখেন মোহাতরম মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এবং সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী।

জলসার দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় অধিবেশন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে বিকাল ৩টায় শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, জনাব সুলতান মাহমুদ। নযম পাঠ করেন জনাব নাসের আহমদ।

বক্তৃতা পর্বে খাতামান নবীঈন (সা.) এর চিরস্থায়ী কল্যাণ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। এরপর আখেরী যুগ ও ঈসা (আ.) এর পুনরাগমন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। জলাসার এ পর্যায়ে নযম পাঠ করেন জনাব খালিদ হোসেন। এরপর বাংলাদেশের আহমদীয়াতের শতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও আমাদের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পাকিস্তান থেকে আগত জনাব এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান।

জলসার ৩য় দিনের চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় ৫ ফেব্রুয়ারী সকাল ৯-৩০ মি: থেকে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সালাহ্ উদ্দিন। নযম পাঠ করেন জনাব মোবারেজ আহমদ সানী।

বক্তৃতা পর্বে শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর আবির্ভাব ও আমাদের দায়-দায়িত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এরপর বাঙ্গালী মন-মানসে ধর্ম ও মানবতা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জনাব এহসান হাবীব জয়। এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব এস, এম রহমতুল্লাহ্। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩টায়। প্রথমে আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কলকাতা থেকে আগত জনাব মোহাম্মদ মাশরেক আলী, সংসদ সদস্য জনাব হাসানুল হক ইনুসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক। এরপর জলসার মূল আকর্ষণ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৮৮তম জলসা উপলক্ষে লন্ডন থেকে সরাসরি সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। মওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং জুবায়ের আহমদ এর নযম পাঠের পর হুযূর (আই.) তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শুরু করেন। হুযূর (আই.) তাঁর বক্তৃতায় হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পৃথিবী যে কোন প্রান্তে বসবাসরত আহমদী একবার যখন হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর সাথে বয়াতের অঙ্গীকার করে আর এ বিষয়ে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে যখন এতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন জগতের কোন শক্তি তাঁর ঈমানকে নষ্ট করতে পারে না। সে বাংলাদেশী আহমদীই হোক আর পাকিস্থানী আহমদীই হোক, ইন্দোনেশিয়ান আহমদীই হোক, আফ্রিকান আহমদীই হোক, ইউরোপীয় আহমদীই হোক বা আমেরিকানই হোক কিংবা দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী আহমদীই হোক তার ঈমানী ভাবাবেগ সর্বক্ষেত্রে একই ধরনের দেখা যায়। বর্তমান যুগে আল্লাহ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিকের আগমন বার্তা পৃথিবীর প্রতিটি মাহাদেশে আর প্রতিটি প্রান্তে পৌছে গেছে।

আমার প্রিয় নবী রহমতুল লিল আলামীন (সা.) সেই পয়গাম এনেছিলেন যা মানুষের অন্তরে তাকওয়াহ (আল্লাহ্ ভীতি) সৃষ্টি করে মানবতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে, তিনি দরিদ্র অসহায়দের আশ্রয়স্থলছিলেন। এতীমদের অবলম্বন ছিলেন, যিনি অভূক্তদের আহার করাতেন, নারী জাতির মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাদের প্রাপ্য তারা যেন পায় সে ব্যাবস্থা করেছিলেন। তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সাথে কথা বলার সময় উত্তম উপদেশ দিতেন। চমৎকার কথা বলে মানুষেল মন জয়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসায় আগত দর্শকদের একাংশ

করতেন। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা পয়স্পরে মাঝে আপশ করে সৌর্হাদ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজের অধিকার ছোড়দেবার জন্য বলতেন। তিনি ইহুদীদের উপাশনায়, খ্রিষ্টানদের উপশনালয় সংসার ত্যাগী মনি ধাশীদের আশ্রমের নিরাপত্তার জন্য সেই ভাবেই ব্যাবস্থা নিতে বলতেন যেভাবে মুসলমানদের মসজিদের নিরাপত্তার ব্যাবস্থা নিতেন। তিনি অমুসলিমদের জান মালের নিরাপত্তার সেই রকম নিশ্চয়তা দিতেন সেরকম মুসলমানদের জান মালে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতেন। মোট কথা উত্তম শিক্ষার যতগুলো দিক থাকতে পারে সবগুলো দিক ইসলামে আছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঐ সমস্ত শিক্ষার এক একটি অক্ষর নিজের বর্ণনা ও বাস্তবায়নের মেধ্য এনে, নিজে কথাও কাজের মধ্যে দিয়ে একটি মহান আদর্শ সৃস্টি করেছেন যা একজন মুসলমানের জন্য চিরদিন উত্তম নমুনা হয়ে আছে, এবং এসবের উপর আমল (কর্ম) না করলে একজন মুসলমান প্রকৃত মুসলমান হয় না।

তারপর মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ আল্লাহর অধিকার আদায় এবং বান্দাদের অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রে হুযূর (সা.)এর নুমনা অনুসারে নিজেরা আবার এমন উত্তম নমুনা সৃষ্টি করেছেন। যা পরবর্তি যুগের মুসলমানদের জন্য নুমান হয়েছে সাহাবী গণ (রা.) নবীয়ে করিম (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যের উত্তম নমুনা এজন্য হয়েছিলেন যে তারা কুরআন শরিফের শিক্ষাকে বুঝতে পেরেছিলেন। ফাত্তাবেমূনী ইহবিবকুমুল্লা (সূরা আলে ইমরান: ৩২) এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন।

আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁরা নবীয়ে করিম (সা.)-এর উত্তম আদর্শকে অনুসরণ করেছেন। এরা এমন মানুষ ছিলেন যাদের অন্তরে তাকওয়াহ বিরাজমান ছিল। এরা এমন মানুষ ছিলেন যে তারা সারাক্ষণ আল্লাহএক সামনে উপস্থিত মনে করতেন। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য, আল্লাহর স্নেহ লাভের জন্য তাদের অন্তরে বিরাট অস্থিরতা বিরাজ করত। তারা জানতেন যে, এই তাকওয়াহ, এই খোদা ভীতি আল্লাহর নিকটবর্তি হবার এই অস্থিরতা পুরণ হতে পারে না যতক্ষণ এই মহানবী (সা.) এর পূর্ণ্য আনুগত্য করা না হয়। তিনি সেই পূর্ণ মানব (সা.) যাকে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য মহান আদর্শ বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

তিনি (আই.) তাঁর বক্তৃতার একাংশে বর্তমান যুগের আলেমদের অবস্থা সম্পর্কে বলেন, বর্তমান যুগের বিভিন্ন ফির্কার আলেমগন কি এ ধরনের হিতাকাঙ্খিতা প্রদর্শন করছে? বরং আমরা দেখি যে প্রত্যেকেই নিজের পান্ডিত্য ও পদের চিন্তায় অস্থির। নিয়্যত খারাপ হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই নিজ স্বার্থ নিয়ে মগ্ন। তাদের মধ্যে হিতাকাঙ্খীতার কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। তারা বলে, এখনই প্রতিশ্রুত মসীহ্ কেন এসে গেছেন? বা দাবীকারক প্রতিশ্রুত মসীহ্ নয়। অথচ স্বয়ং আলেমদের আচরনই প্রমান করছে যে এটাই সেই যুগ। এটাই সেই প্রকৃত সময় যা মসীহ্ মাওউদ এর আগমনের জন্য নির্ধারিত ছিল। তারা বলে, আমাদের জন্য আমাদের রসূলের আদর্শই যথেষ্ঠ। কুরআন করীমের শিক্ষাই যথেষ্ঠ। অথচ বলুন, এমন কে আছে আজ যে কুরআন করীমের শিক্ষার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে এবং একই সঙ্গে এর শিক্ষা নিজেও পালন করছে? আমরা আহমদীগণ জানি যে আজ কোন ফির্কার মধ্যেই এটি বিদ্যমান নেই। কিন্তু সৎ-প্রকৃতির মুসলমান সাধারন যখন নিজের আশপাশে পর্যবেক্ষন করে, সর্বাপেক্ষা অহিতাকাঙ্খীতা তখন এসব নামধারী ধর্মের ঠিকাদার ও আলেমদের মধ্যেই দেখতে পায়। সংবাদ পত্রের কলাম সমূহে কখনো কখনো এটি ব্যক্তও করা হয়। অতএব, সব মুসলমানদের

লন্ডন থেকে বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসার সমাপ্তি বক্তব্য রাখছেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করছেন মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব

চিন্তা করা প্রয়োজন যে এসব লোকদের আর কতদিন তাদের ধর্মীয় নেতার আসনে বসিয়ে রাখবে?

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করতে চাই যদি সম্ভব হয় যে কারো হৃদয় চিরে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যেত যে এখানে প্রকৃত কলেমা আছে বা বানওয়াটী? তাহলে প্রত্যেক আহমদী নিজের হৃদয় চিরে তা দেখানোর জন্য প্রস্তুত আছে। যেখানে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত প্রত্যেকের হৃদয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র মূল খুবই গভীর ভাবে দৃষ্টিতে পড়বে।

হুযূর (আই.) প্রতিবেশির হক সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ইসলামের খুবই সুন্দর একটি শিক্ষা হল প্রতিবেশির সাথে সৎ ও ভাল আচরণ করা। প্রতিবেশির সাথে হযরত রাসূল করীম (সা.) ব্যবহার ছিল অনেক উন্নত পর্যায়ের। তিনি (সা.) বলতেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) বার বার আমাকে প্রতিবেশির সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য আদেশ দিতেন এমনকি আমার মনে হত যে, প্রতিবেশিকে না আবার সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়।

এমনই অগনিত বিষয় আছে যা হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর মাঝে পাওয়া যেত যা এখন সময় স্বল্পতার কারণে বর্ণনা করা যাচ্ছে না। যে কোন বৈশিষ্ট্যাবলী নিন না কেন, সে ক্ষেত্রে নবী করীম (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য আকাশ চুম্বি দৃষ্টিগোচর হবে। আজকালের ধর্মের নামধারী আলেম ওলামা যারা অপরকে কাফের ফতওয়া প্রদান করে থাকে তাদের মাঝে কি আদৌ এমন বৈশিষ্ট্য আছে? প্রতিবেশিরাতো এদের হাত থেকে কখনও নিরাপদ নয়। প্রতিনিয়ত জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর সম্মুক্ষিণ হতে হচ্ছে আর তাদের প্রতিবেশিরা সর্বদা তাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়। বাংলাদেশের পরিস্থিতিও অনুরূপ আর এই ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতাও আছে।

তিনি (আই.) বাংলাদেশের সকল আহমদীদের উদ্দেশ্যে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী যুবকদেরও এটি কাজ, আনসারুল্লাহ্ সদস্যদেরও এটি দায়ীত্ব আর লাজনা ইমাইল্লাহ্ সদস্যাদেরও এটি দায়ীত্ব যে, নিজেদের নমূনা এমন উন্নত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করুন যা হযরত নবী করীম (সা.) আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমস্ত জামাতের ব্যবস্থাপনাকে প্রথমে নিজেদের মাঝে সংশোধন করতে হবে তারপর এই বাণীকে দেশের প্রান্তে প্রান্তে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছান আবশ্যক। নিজেদের স্বদেশবাসীদের সামনে এটা প্রমাণ করুণ যে, আজকে কেবলমাত্র আমরাই আছি যারা সবচেয়ে বেশি হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভালবাসার বার্তা বহণকারী। এটিই সেই বাণী যা নিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এসেছেন।

অতএব, আপনারা সামনে অগ্রসরমান হোন আর এই যুগের ইমামকে মান্য করার হক্ব যা আছে তা আদায় করুন। সংশধন আর অযথা চিন্তার মধ্যে পড়ে থাকবেন না। শত্রুরা আহমদীয়াতকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশেষ যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে, এতে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তারা কখনও সফল হবে না। এটি তাদের শেষ অপচেষ্টা আর এর পরে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তাদের মৃত্যু নিদ্ধারিত।

হুযূর (আই)-এর দোয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। জলাসার সংবাদ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ হয়।

[ডেস্ক রিপোর্ট]

সংবাদ

সরাইল জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে গত ২০.০১.২০১২ তারিখ বাদ জুমুআ সরাইল জামাতে সিরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মেনহাজ উদ্দীন ঠাকুর (অলক), প্রেসিডেন্ট, সরাইল জামাত, কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফজল আহমদ, বাংলা নযম পাঠ করেন এস, এম নঈমউল্লাহ্, এরপর বক্তব্য প্রদান করেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ জনাব আলহাজ্জ রফিকুল ইসলাম হারিছ, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধৈর্যধারণ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ, এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদাপ্রেম বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. এনামুল হক রনী, মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। এতে সর্বমোট ২৪ জন আহমদী ও ১৭ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক রনী

বিষ্ণুপুরে জামাতের সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জানুয়ারী আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষ্ণুপুরের উদ্যোগে এক সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ শাহজাহান ভূইয়া, প্রেসিডেন্ট, বিষ্ণুপুর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সাইদ আহমদ খন্দকার ও মোশারফ হোসেনএ কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। মোহাম্মদ শফিক আলম, মিনহাজ উদ্দিন, আমীর মাহমুদ ভূইয়া, ও স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. আব্দুল হাকিম। বিশেষ অতিথি বৃন্দও বক্তব্য রাখেন। এতে ৪৭ জন অংশগ্রহণ করেন এবং ৭ জন বয়আত গ্রহণ করেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়।

আব্দুল হাকিম

লাজনা ইমাইল্লাহ শ্যামপুরে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১০/১২/২০১১ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ শ্যামপুরের উদ্যোগে দুই ঘন্টব্যাপী তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ও নামায পড়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এতে ২৫ জন মেহমান, ৯ জন লাজনা, ১ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

লুৎফা আহমদ

উথলিতে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৯/০১/২০১২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ ঘাটিকা হতে রাত ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত উথলিতে তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। তবলীগি সেমিনারে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হায়াত বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব তারেক আহমদ। এবারের তবলীগি সেমিনার প্রতিবেশী আত্মীয়, সহপাঠি, বন্ধুদেরকে নিয়ে করা হয়। মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু। দোয়ার মাধ্যমে ও রাতের খাওয়ার পরে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মুয়াযযেম আহমদ সানী

কৃতী ছাত্রী

* আমাতুস সামী আশা, নিউসোনাতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১১ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নিউসোনাতলার আক্কেল আলী ও মরীয়ম আলীর মেয়ে। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

* কানিজ মাহজেবিন, আলহাজ্জ এয়াকুব আলী গালস স্কুল এন্ড কলেজ, চট্রগ্রাম থেকে ২০১১ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্রগ্রামের এস,এম,মাহামুদ জামান ও নাছরীন আহমদ চৌধুরীর ছোট মেয়ে। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দু:খের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুমিল্লার সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব ডা: এম, এ, আজিজ বার্ধক্যজনিত কারণে গত ২৪/০১/১২ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭-৪৫ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুম অত্যন্ত নেক ও ভাল মনের মানুষ ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে কুমিল্লা জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর তবলীগে কুমিল্লায় বহু লোক আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ করেছেন এছাড়া কুমিল্লা জামাত প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীরও অবদান অনেক রয়েছে। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে তিনি তাঁর জন্মস্থান দাউদকান্দি এবং কুমিল্লায় প্রচন্ড মোখালেফাতের সম্মুখিনও হয়েছেন। শত বিরোধিতা থাকা শর্তেও আহমদীয়াতের উন্নত আদর্শ থেকে তাঁকে সামান্য পরিমাণও হেলাতে পারেনি। মহান খোদা তা'লা মরহুমকে জান্নাতের উচ্চ মকামে স্থান দিন এবং তাঁর রেখে যাওয়া বংশধরদের ধৈয্য ধারণের তৌফিক দান করুন।

আবুল খায়ের
নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪

২১ শে ফেব্রুয়ারি
"আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"
উপলক্ষে আমরা
গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানাই
সেই সব বীর শহীদ ও
ভাষা সৈনিকদের যারা
এ ভাষার জন্য লড়েছেন এবং
প্রাণ দিয়েছেন।

-সম্পাদক

তেজগাঁও জামাতে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান প্রদর্শন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এর উদ্যোগে সদ্য সমাপ্ত সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান তেজগাঁও মসজিদের নিচের তলায় মেহমানদের দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এতে প্রথম দিনেই প্রায় ৪০জন মেহমান এ অনুষ্ঠান দেখেছেন। অনুষ্ঠান শেষে তাদের সবার হাতে আহমদীয়া জামাতের পরিচিতিমূলক লিফলেটটি দেয়া হয়। তারা সবাই এই অনুষ্ঠানের প্রসংশা করেন। এছাড়া বাকী তিন দিনও কিছু কিছু করে মেহমান এ অনুষ্ঠান দেখেন।

সৈয়দ মহিদুল ইসলাম

ঘড়িলাল মজলিসে ওয়াকারে আমল

ঘড়িলাল জামাতে গত ৭/১২/২০১২ তারিখে ১০০ হাত লম্বা একটি শাকো নির্মাণ করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। যার ফলে কমপক্ষে ২৫টি পরিবার উক্ত শাকোটি ব্যবহার করে যাতায়াত সুবিধা পাচ্ছে। ওয়াকারে আমলে ১০ জন খোদ্দাম এবং ৪ জন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ওয়াকারে আমল পরিচালনা করেন স্থানীয় নাযেম ওয়াকারে আমল জনাব মাকছুদুল আলম এবং সার্বিক সহযোতিা করেন স্থানীয় কায়েদ জনাব কে, এম, নজিবুল্যা হুসাইন এবং স্থানীয় ঘড়িলাল জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ লিয়াকত হোসেন খান

কে, এম, নজিবুল্যা হুসাইন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৮ ও ১৯ জানুয়ারী ২০১২ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী প্রথম তালিম তরবিয়তী ক্লাস সাফল্যের সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথম দিন কুরআন তেলাওয়াত করেন, শারমিন আক্তার (মুনা) দোয়া ও আহাদনামা পাঠ করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। হাদীস পাঠ করেন কুররাতুল এ্যাইন এবং নযম পাঠ করেন তানিয়া সামাদ। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন স্বপ্না মেহতাব। বয়আতের ৪নং ও ৭নং শর্ত নিয়ে আলোচনা করেন রিনাত ফৌজিয়া, এরপর সহীহ্ কুরআন শিক্ষা ক্লাস ও উর্দূ শিক্ষা ক্লাস পরিচালনা করেন নাছিমা বশির। পরের দিন হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে আলোচনা করেন নাছিমা বশির। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করা এবং তাঁর হাতে বয়আত করার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, আফরোজা মতিন এরপর উপস্থিত লাজনাদের থেকে প্রতিযোগিতামূলক উপস্থিত বক্তৃতা, কুরআন তেলাওয়াত এবং উর্দূ প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসে প্রথম দিন ৯৯ জন ও ২য় দিন ৬৭ জন লাজনা বোন উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী এই তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্তি হয়।

হেলাঞ্চাকুঁড়িতে ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে নদীর ওপর সাঁকো নির্মাণ

হেলাঞ্চাকুঁড়ি-সাইনগর মসজিদের পূর্ব পাশ দিয়ে গর্ভেশ্বরী নদী প্রবাহিত হয়েছে, সদরপুর হালকার আহমদীগনকে মসজিদে আসতে হলে এই নদীর পানি ভেঙ্গে আসতে হয়। নতুবা প্রায় ৪ মাইল অতিক্রম করতে হয়। এ ছাড়া শীত কালেও হাটু জল ভেঙ্গে ৩টি গ্রামের অনেক মানুষ প্রতিদিন এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। নদীটির বর্তমান প্রস্ত ৪৫ ফিট। জনসাধারণের উপকারার্থে হেলেঞ্চাকুঁড়ি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে আহমদীদের বাঁশ ঝাড় থেকে অনুমতিক্রমে বাঁশ কেটে এনে গত ১৯ ও ২০ জানুয়ারী ২দিন পরিশ্রম করে ২৫ ফিট দৈর্ঘ্যের মাচা বানিয়ে নদীর উপর সাঁকো তৈরী করা হয় আর বাকি ৩৫ ফিট অল্প অল্প পানির উপর মাটি ফেলে রাস্তা তৈরী করে দেয়া হয়। একাজ দেখে গ্রামবাসী আহমদীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

মৌ. শাহ আলাম খান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারী, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তালিম-তরবিয়তী ক্লাস সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কেন্দ্রীয় সিলেবাস অনুযায়ী সহী উচ্চারণে কুরআন শিক্ষা, হাদীস সমূহ। ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা, নামায, ইস্তেগফার, বাংলা/উর্দু নযম ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পাঠদানে অংশ নেন পর্দার আড়াল থেকে মৌ. আসাদুল্লাহ্ আসাদ, মুফাত্তিস জনাবা মাকসুদা ফারুক, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, শামীমা আক্তার লিলি, নাসিমা আসাদ, মাহমুদা সুলতানা কলি এবং আমাতুন নূর। উক্ত ক্লাসে মোট ২১৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ক্লাস সমাপ্ত হয়।

নাসিমা আসাদ

স্থানীয় ৪টি মজলিসের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ ও লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় ৪টি মজলিসের সমন্বয়ে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ রোজ শুক্রবার স্থানীয় মসজিদ 'বায়তুল ওয়াহেদ'-এ লাজনা ইমাইল্লাহ্র একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত কর্মশালায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন যথাক্রমে সেক্রেটারী তবলীগ, কামরুন্নেছা স্বপন এবং সেক্রেটারী সানাত ও দাস্তকারী নার্গিস ইসলাম। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ঘাটুরা মজলিস থেকে ৪ জন, শালগাঁও মজলিস থেকে ২ জন, নাটাই মজলিস থেকে ৪ জন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিস থেকে ১৫ জনসহ মোট ২৫ জন স্থানীয় কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশ নেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে সকল স্থানীয় কর্মকর্তাগণকে তাদের নিজ নিজ দপ্তরের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দেন।

২০ শে ফেব্রুয়ারি
"মুসলেহ্ মাওউদ দিবস"
উপলক্ষে আমরা
আমাদের সকল
পাঠকদের জানাই
আন্তরিক শুভেচ্ছা ও
মোবারকবাদ।
-সম্পাদক

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহ্‌মাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 15th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15 February, 2012 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

তৃতীয় শাখা এখন গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
ওয়ান্ডারল্যান্ড, গুলশান
(পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে)।
রোড-১০৩, গুলশান-২
মোবাইল: ০১৯১৩৯৪১৩৯২

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com